১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

সম্পাদক

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ইসলামী আইন ও বিচার

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল : জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৫

যোগাযোগ : সমন্বয়কারী
এস এম আবদুল্লাহ
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ শ্যামলী রিং রোড, পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭২ ৮২৭২৭৬
E-mail : ilrclab@yahoo.com

অক্ষর বিন্যাস : মোঃ রাশেদুল ইসলাম বুলু

মুদ্রণ : আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM, General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3 .

সূচিপত্র

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস
২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ
৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা
৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার
৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন
৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম
৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি

লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা), ১৪ শ্যামলী রিং রোড, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫ মোবাইল : ০১৭২-৮২৭২৭৬, E-mail : ilrclab@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্যে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

পাঠকের মতামত আমরা আগ্রহ সহকারে ছাপাই।

গ্রাহক চাদার হার

প্রতি সংখ্যা	:	টাকা ৩৫
প্রতি ৬ মাসে	:	টাকা ৭০
প্রতি বছরে	:	টাকা ১৩০

সম্পাদকীয়

আমরা মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে চাই

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী আমরা নিয়মিতভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছি। এ সংখ্যা হতে এ পত্রিকাটি প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকাবে ইনশাআল্লাহ।

একুশ শতকের এ বিশ্বে আমরা মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে চাই। পৃথিবীর ছয়শ কোটি মানুষের এক পঞ্চমাংশ মুসলমান। অর্ধশতের বেশি স্বাধীন রাষ্ট্র সীমানায় আমরা ইসলামী আইনের শাসন জারি করার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও সে সৌভাগ্য মুসলমানদের হয় নি। ইসলামী আইন আজ মুসলমানদের মধ্যেই অপরিচিত হয়ে পড়েছে। প্রায় এমনি একটি কথা নবী স. বলেছেন :

'বাদাআল ইসলামু গারীবান, ওয়া সাইয়াউদু কামা বাদাআ, ওয়া তূবা লিল গুরাবা।'

'ইসলাম এসেছিল অপরিচিত অবস্থায়।' অর্থাৎ সমস্ত নবী রসূলের আমল থেকে চলে আসা পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ইসলামের তখন কোনো পরিচিতিই ছিল না। আবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে নতুন করে তাকে পরিচিত করেছেন। তার দাওয়াত দিয়েছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'পরিচিত মানুষদের মধ্যে ইসলাম আবার আগের মতো অপরিচিত হয়ে যাবে।' অর্থাৎ শত শত বছর পরে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী পরিবেশ খতম হয়ে যাবে। ইসলামী আইন অনুসারে মুসলমানরা জীবন যাপন করবে না। অনৈসলামের তুলনায় ইসলাম মুসলমানদের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠবে। ইসলামী আইন জারি করার পথে মুসলমানরাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

'এ অবস্থায় অপরিচিতজনদের জন্য মুবারকবাদ।' অর্থাৎ প্রকৃত মুমিনরা যারা ইসলামকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সমাজে নিগৃহীত ও নির্যাতীত হয়ে ক্ষমতাহীন ও সহায়তাহীন জীবন যাপন করবে, পরিচিতজনদের মধ্যেও যারা অপরিচিতের মতো অবস্থান করবে এবং নিজেদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবে তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

হাজার দেড় হাজার বছরের পথ পরিক্রমার পর আমরা প্রায় এই অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছি। এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা তের কোটি, ইসলাম ও কুরআনের জ্ঞান সম্পন্ন আলেম উলামার সংখ্যা হাজার হাজার হলেও এবং হাজার হাজার মাদরাসায় প্রতিদিন ইসলামের পাঠ অবিরত ধারায় চললেও, দেশের অগণিত মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার লাখো লাখো মুসলমান আল্লাহর কাছে নতশির হলেও তাদের ওপর আল্লাহর আইনের শাসন চলছে

না। তাদের ওপর চলছে দুনিয়ায় যারা তাগুত ও শয়তানের রাজত্ব কায়েম করেছে তাদের আইনের শাসন। এই তাগুত ও শয়তানের আইনের চর্চা চলছে দুনিয়ার সমস্ত পার্লামেন্টে। সেখানে ইসলামকে সন্ত্রাস এবং আল্লাহর আইনের শাসনকে জুলুম হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আর মুসলমান শাসকরা তাদের তাবেদারী করাকে নিজেদের সাফল্য মনে করে নিয়েছে। কেবল শাসকরাই বা কেন কালক্রমে মুসলিম এলিট শ্রেণীর মধ্যে একটি বিরাট গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়ে গেছে যারা আল্লাহর আইনের শাসনকে দেশের ও জাতির জন্য ক্ষতিকর মনে করতে শুরু করেছে। কারণ এটা তাদের সারা জীবনের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা এবং পার্থিব কর্মকাণ্ড ও স্বার্থচিন্তা বিরোধী।

কোর্ট-কাছারীতে যারা আইন চর্চা করেন তারা কোনো কেতাবে এই আল্লাহর আইনের কথা পড়েন নি। কাজেই আল্লাহর আইনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার কথা শুনে তারা আকাশ থেকে পড়েন। আর দেশের উলামায়ে কেরাম মক্তব মাদরাসায় গুটিকয়েক ছাত্রকে কুরআন হাদীস পড়িয়ে এবং জলসায় ওয়াজ নসিহত করে মনে করেন তাঁদের দায়িত্ব শেষ।

এই হচ্ছে আমাদের দেশে ইসলাম কুরআন ও আল্লাহর আইনের হাল হকিকত। অথচ একজন মুসলমানের সংগাই একথা নির্ধারণ করে দেয় যে তাকে কুরআন ও আল্লাহর আইনের আওতায় বসবাস করতে হবে। কারণ সে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ঘোষণা করে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার বাণীবাহক হিসাবে মেনে নিয়েই ইসলামে প্রবেশ করেছে। কাজেই মুসলিম অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এমন জীবন যাপন করতে হবে যে জীবনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বলে মানা যাবে না। এখন ইলাহর অর্থ কুরআন কি বর্ণনা করেছে দেখা যাক:

'ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল তখন কি তোমরা সেখানে ছিলে ? সে যখন তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে ? তারা বলেছিল, আমরা আপনার ইলাহর এবং আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহর ইবাদত করবো। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।' (বাকারা : ১৩৩)

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের একত্র করবেনই এতে সন্দেহ নেই। কে আল্লাহর চাইতে বেশি সত্যবাদী ?' (নিসা : ৮৭)

'এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।' (আন'আম : ১০২)

'তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি যা কিছু অহী করা হয় তার অনুসরণ করো। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আন'আম : ১০৬)

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো যাতে তোমরা পথ পাও।' (আরাফ : ১৫৮)

'তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট,

তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।' (তওবা : ১২৯)
'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিকানা তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো ?' (যুমার : ৬)
'যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, শাস্তিদানে কঠোর শক্তিশালী, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে।' (মুমিন : ৩)
'তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতি মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র মহান।' (হাশর : ২৩)
'তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। কাজেই তাঁকেই গ্রহণ করো কর্মবিধায়ক রূপে।' (মুয্যাম্মিল : ৯)
'বলো, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহর।' (নাস : ১, ২, ৩)
'সে (মূসা) বলল, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য কি আমি অন্য ইলাহ খুঁজবো, অথচ তিনি তোমাদের সমস্ত বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ?' (আ'রাফ : ১৪০)
'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনো তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করবো না। যদি করে বসি তাহলে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত।' (কাহ্ফ : ১৪)
একমাত্র আল্লাহই তোমাদের ইলাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।' (তা-হা : ৯৮)
'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করবো ? দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।' (ইয়াসীন : ২৩)
কুরআনের এ আয়াতগুলোতে ইলাহর যে পরিচিতি ফুটে উঠেছে সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হচ্ছে :

১. তিনি বিশ্বজাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুর স্রষ্টা। সবার আহার যোগাচ্ছেন, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি দান করছেন এবং প্রতিপালন করছেন।
২. তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্ব জাহানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু মহাআরশ তাঁর একক কর্তৃত্বে পরিচালিত। সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিকানা তাঁরই। তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের অধিকর্তা ও কর্মবিধায়ক।
৩. তিনি জীবন মৃত্যুর অধিকারী। তিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, শাস্তি দান করেন। মানুষের জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি কাউকে শাস্তি দিতে বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে কারোর সুপারিশ কোনো কাজে লাগে না। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।
৪. সর্ববিষয়ে তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।
৫. তিনি পবিত্র। তিনি শান্তি। তিনি নিরাপত্তা। তিনি রক্ষক। তিনি পরাক্রমশালী প্রবল ও

মহিমান্বিত। মানুষকে তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন।

৬. তাঁর অহীর অনুসরণ করতে হবে। তাহলে মানুষ পৃথিবীতে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তাঁর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে হবে।
৭. সমস্ত মানুষের তিনিই একমাত্র ইলাহ। একমাত্র তাঁরই ইবাদত বন্দেগী আরাধনা উপাসনা করতে হবে। আর কারোর ইবাদত করা যাবে না।
৮. কিয়ামতের দিন তিনি সবাইকে একত্র করে তাদের কাজের হিসাব নেবেন।

যে ইলাহকে মেনে নিয়ে আমরা ইসলামে প্রবেশ করলাম তিনি কেবল আমাদের ইবাদত বন্দেগীর ইলাহ নন, তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, বিশ্ব জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক মেনে নিয়ে তাঁর পাঠানো অহী তথা আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই, কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত বন্দেগী গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কারণ উল্লেখিত ক্ষমতা ও গুণাবলী বিযুক্ত যে ইলাহ সে ইলাহ আসলে কুরআন বিধৃত ইলাহ নয়। বরং সে ব্যক্তির মনগড়া ও প্রবৃত্তি তাড়িত ইলাহই হতে পারে। তের কোটি মুসলমানের এ দেশে আমরা আল কুরআনের ইলাহরই ইবাদত করতে চাই, কোনো মনগড়া বা প্রবৃত্তির ইলাহর নয়।

'ইসলামী আইন ও বিচার' এই অর্থে আল্লাহ ও কুরআনের সাথে আমাদের অংগীকার পূরণের একটি বাহন হিসাবে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ। এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা এক দিকে সচেতন গোষ্ঠীকে আল্লাহর আইনের শাসনের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবে এবং অন্য দিকে সাধারণ মানুষকে তাদের অঙ্গীকার পাকাপোক্ত করার আহ্বান জানাবো। বাংলাদেশে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলা, আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান ও ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুসলমানদের জীবনধারার সাথে ইসলামী আইনের সামঞ্জস্য বিধান এবং একই সাথে অনৈসলামী আইনের গলদগুলো চিহ্নিত করা হবে আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব।

আসলে জীবন একটা বাস্তব সত্যের দিকে এগিয়ে যাবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যই, মিথ্যা নয়। 'জীবনটা শুধু মিথ্যারই কারবার'– এটা কেবলমাত্র সাময়িকভাবেই হতে পারে। কিন্তু মিথ্যার সাথে সত্যের দ্বন্দ্বে সত্যই অবশেষে এবং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আইন সত্যেরই প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে মানুষের তৈরি আইন জীবনের বাস্তবতার নিরীখে এগিয়ে গিয়েও সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে কিন্তু সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বঘটনাবলীর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহর আইন সত্যই সত্য, পুরোপুরি হক ও ইনসাফ। তার মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্রও নেই। সে ক্ষেত্রে ইজাতিহাদের মাধ্যমে মানুষের ফয়সালার যে সংযোজন হয় তা কখনো ভুল হলেও আল্লাহ তাকে 'একটি সওয়াবে'র তথা সত্যের একটি অংশের মর্যাদা দিয়েছেন আর সঠিক হলে 'দশটি সওয়াব' তথা পূর্ণ সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

আমরা আল্লাহর এই পূর্ণ সত্যের মাধ্যমে সুসংগঠিত আইনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে চাই।

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী শরীয়তের তাৎপর্য ও উৎস

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

শরয়ী বিধানের সংগা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

'মহান আল্লাহ্ জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য।' তাদের নিকট রসূল পাঠিয়েছেন একের পর এক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগে। এভাবে রসূল পাঠাবার পর তাদের আল্লাহর প্রতি কোনোরূপ দোষারোপ করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁদের সাথে কিতাবও নাযিল করেছেন মানুষকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে এবং অন্ধকার থেকে আলোকের মধ্যে আনার জন্য। মানুষের কাছে অহী পাঠাবার জন্য তাদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাছাই করে নিয়েছেন। এ অহী তাঁর অন্তরদেশ ও বহিরদেশকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। অহী-ই হচ্ছে পথ প্রদর্শনকারী এবং প্রধান পথ প্রদর্শক। মহান আল্লাহ্ বলেন :

'এভাবে আমি তোমার প্রতি অহী নাযিল করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমি তাকে করেছি আলো, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই।'[১]

ফলে কুরআনই তাঁর সমগ্র জীবন-চরিতে পরিণত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[২] কারণ তিনি অহীর নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছেন। ফলে তাঁর জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড সেই অনুযায়ী ঢালাই হয়েছে। এভাবে অহী হয়ে গেছে তাঁর পরিচালক।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর অহীর হুকুমের প্রবক্তা, তাঁর অনুগত এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁর এ বৈশিষ্টই ছিল তাঁর প্রতি আরোপিত সত্যের সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যখনই তাঁর প্রতি হুকুম এসেছে, তিনি তা পালন করেছেন। যখনই কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তিনি তা বর্জন করেছেন। যখনই ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তিনি

লেখক: ডক্টর ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত তাঁর আন্তরজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থ 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামিয়াহ' থেকে এ প্রবন্ধটি গৃহীত।

সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক ভীত হয়েছেন। মোট কথা তিনি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়তকে নিজের শাসকে পরিণত করেন এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী সত্য-সঠিক পথ পাড়ি দেন। এ কারণে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর প্রশংসা করেছেন। আল্লাহর প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণ ও বন্দেগীর প্রশংসা করে তাঁকে তাঁর সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তরভুক্ত করেছেন।

এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী শরীয়ত সমগ্র মানব জাতির ওপর কর্তৃত্বশালী হয়। তাদের জন্য হয় আলোর দিশা। এ আলোয় তারা এগিয়ে চলে সত্যের পথে। যখন তারা নিছক মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে নয় বরং শরীয়তের বিধান সমূহ মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কথায়, কর্মে ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলে তখন জীবন হয় মর্যাদাশালী। কারণ আল্লাহ মর্যাদাকে সম্পৃক্ত করেছেন তাকওয়ার সাথে, অন্য কিছুর সাথে নয়। আল্লাহ বলেন:

'অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই মর্যাদাশালী যে আল্লাহকে ভয় করে।'[৩] কাজেই মানুষের মধ্যে শরীয়তের সর্বাধিক আনুগত্য করে তার সংরক্ষণকারী ব্যক্তিই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। অন্যথায় তার উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সুদূরপরাহত।

কাজেই শরীয়তের কর্তৃত্ব বেশী করে মেনে নেয়ার ওপরই মানুষের মর্যাদা নির্ভরশীল। আর ইসলামের শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহর শরীয়ত, যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং অন্য সকল শরীয়ত বাতিলকারী ও তাদের ওপর বিজয়লাভকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে এ শরীয়ত তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে অনাবিল সুখ ও শান্তিতে ভরে দেয়। যে ব্যক্তি এ পথে চলে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। আর যে ব্যক্তি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং কিয়ামতের দিন সে উত্থিত হবে অন্ধ অবস্থায়, আপাত দৃষ্টিতে তাকে যতই সুখী ও সততার অধিকারী দেখা যাক না কেন। কাজেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কথায় ও কর্মে তাঁর শরীয়তের আনুগত্যই পবিত্র ও শান্তিময় জীবনের ধারক।

শরীয়তের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

শরীয়তের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, এমন একটি প্রকাশ্য পথ যে পথে পানির কাছে পৌঁছানো যায় এবং এমন একটি পানির ঝর্ণা যেটা মানুষ তৈরি করেছে। অর্থাৎ সে পানি তাদের দিকে নেমে আসে এবং তারা তা থেকে পান করে এবং পরিতৃপ্ত হয়। আরবরা এ স্থানটিকে ততক্ষণ শরীয়ত বলে না যতক্ষণ না তা অবিরত ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে এবং প্রকাশ্য ও নির্দিষ্ট থাকে, রশি দিয়ে বালতি নামিয়ে তা থেকে পান করতে হয় না। শরীয়ত শব্দটি গৃহীত হয়েছে তাশ্‌রী' থেকে। এ হচ্ছে উটের রীতি বর্ণনা করা অর্থাৎ উট হাউজে পানি পান করে না এবং পানি বের করে এনে দৃঢ়ভাবে তার সামনে ধরতে হবে তবে যে সে পান করবে, এরও সে মুখাপেক্ষী নয়। কথায় বলে তাশরী' হচ্ছে অতি সহজে পানি পান করা।[৪]

শরীয়তের পারিভাষিকঅর্থ হচ্ছে, কার্যকর অনুশাসন ও বিধি। সম্ভবত শরীয়ত বিশারদগণ এটি গ্রহণ করেছেন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে:

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি তৈরি করেছি শরীয়ত ও পথ।'[৫]

'তারপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি শরীয়তের বিশেষ বিধানের ওপর।'[৬]

কাতাদাহ্ বলেন : শরীয়ত হচ্ছে, আদেশ-নিষেধ এবং হুদূদ (শাস্তি) ও ফরয সংক্রান্ত বিধান। কারণ শরীয়ত একটি পথ, যা সত্যের দিকে চলে।[৭]

ইবনে আছীর তাঁর নিহায়াহ গ্রন্থে বলেছেন : 'শরীয়ত হচ্ছে, আল্লাহ দীনের মধ্য থেকে যা কিছু তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচলন করেছেন এবং তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় করেছেন। বলা হয়ে থাকে : তাদের জন্য শরীয়ত (বিধিবদ্ধ) করা হয়েছে, কাজেই বিধিবদ্ধকারী হিসাবে সে শারে'। আর আল্লাহ্ দীন বিধিবদ্ধ করেছেন শরীয়ত হিসাবে যেহেতু তিনি তাকে প্রকাশ করেছেন ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।'[৮]

এর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি : শরীয়ত বলতে দীন বুঝায়, যা রসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে এনেছেন মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করার জন্য আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করার জন্য আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে। আর এ অর্থেই শরীয়ত শব্দটি বিশ্বাস ও কর্ম উভয় দিকেই প্রসারিত। এ দুটিই সম্মিলিতভাবে দীনে কামেল তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তবে ফকীহগণের ভাষায় শরীয়ত কেবল ব্যবহারিক বিধিবিধানকেই বুঝায়।

কেউ কেউ এর সংগা এভাবে নির্দেশ করেছেন :[৯] শরীয়ত এমন বিধিবিধানকে বুঝায়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যার প্রচলন করেছেন, যাকে জীবনে কার্যকর করে তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারে। আর আল্লাহ্ দীন প্রচলন করেছেন অর্থাৎ তা প্রণয়ন করেছেন। এটি আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ বলেন :

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে।'[১০]

আল্লাহ ছাড়া আর কারোর শরীয়ত প্রণয়ন করার অধিকার নেই। এ আয়াতটি একথা প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য দীনের বিধান প্রণয়ন করা এবং তাকে শরীয়ত নামে অভিহিত করা মূলত শরীয়ত শব্দটির ধাতুগত অর্থই প্রকাশ করেছে। আমাদের আলোচ্য অবশ্য এখন এটা নয়। কারণ আমরা শরীয়ত বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যথাযথ বৈধ বিধান সমূহ।

ফকীহগণ শরীয়ত শব্দের এ অর্থই করেন। এ ক্ষেত্রে তাহলে শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকে ?

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, শরীয়তের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, পানির উৎস বা এমন পথ যা পানির কাছে পৌছিয়ে দেয়। আর পারিভাষিক অর্থে এটি হচ্ছে মানুষকে পথ দেখাবার

জন্য বিধিবিদ্ধ আইন। এ থেকে আমরা জানতে পারি, এ দুয়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনকারী হচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করা যেমন তাফসীরে আবু সউদে বলা হয়েছে : আইন ও শরীয়ত হচ্ছে পানির কাছে পৌছুবার পথ। দীনকে তার সাথে তুলনা করা যায়। কারণ দীন হচ্ছে এমন একটি পথ, যার সাহায্যে চিরন্তন জীবনের পথে পাড়ি জমানো যায়, যেমন পানির সাহায্যে আমরা এই অস্থায়ী জীবনে উপকৃত হই।[১১]

বলা হয়, দীন হচ্ছে কর্মজীবনের একটি পথ যা কর্মীকে আভ্যন্তরীণ ময়লা ও আবর্জনা মুক্ত করে। তেমনি শরীয়ত পানির কাছে যাবার একটি পথ, যা তার পথিককে ইন্দ্রিয়াসক্তির নোংরামি থেকে পবিত্র করে।[১২]

'মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন' গ্রন্থের লেখক আল্লামা রাগেব ইস্‌ফাহানী বলেন : পানির শরীয়ত বা পথের সাথে তুলনা করে শরীয়তকে শরীয়ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ পানিতে যে অবগাহন করে যথার্থভাবে সে মলিনতা মুক্ত ও পবিত্র হয়। কোনো কোনো দার্শনিক বলেন : আমি পান করেছিলাম কিন্তু তৃষ্ণা প্রশমিত হয়নি। তারপর যখন আমি আল্লাহকে চিনলাম তখন পান ছাড়াই আমার তৃষ্ণা প্রশমিত হলো। আর পবিত্র করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

'আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে হে নবী পরিবার! এবং তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে চান।'[১৩]

কাজেই পানির শরীয়ত বা পথে আছে দেহের জীবন। অন্যদিকে আল্লাহর শরীয়তে রয়েছে আত্মার জীবন ও বিবেকের পবিত্রতা এবং দীনী ও দুনিয়াবী জীবনে মানুষের সাফল্য।

শরীয়ত ও তাশ্‌রী'– এর মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ শাব্দিক অর্থে শরীয়ত বলা যায় সেই স্থানকে যেখানে পানি পান করা হয়। আবার তাশরী' বলা হয় উটের আচরণ বর্ণনা করাকে। অন্যদিকে ফকীহগণের পরিভাষায় তাশরী' শব্দটির দুটি অর্থ বর্ণনা করা হয়। এক. প্রাথমিক ও মৌলিক আইন কানুন রচনা করা। ইসলামে এটি একমাত্র আল্লাহর অধিকারভুক্ত। দুই. প্রতিষ্ঠিত শরীয়ত থেকে বিধান গ্রহণ করা। তার কোনো 'নস্‌' থেকে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা তার উপস্থাপিত কোনো যুক্তি-প্রমাণ থেকে কিংবা তার কোনো মূলনীতি, প্রাণশক্তি ও তাৎপর্য থেকে। তাশরী' এর এই উভয় অর্থই মূল আশ্রিত। কিন্তু ইসলামে প্রথম অর্থেই তাশ্‌রী'-এর প্রচলন শুরু হয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ছাড়া মূলত আইন প্রণয়নের অধিকার আর কারোর নেই। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে পরোক্ষ– প্রত্যক্ষ বা মূলগত নয়। কারণ বিধানের মধ্যে যে হুকুমটি গুপ্ত থাকে উদ্ভাবনকারী তা থেকেই উদ্ভাবন করে থাকেন, তিনি কোনো নতুন হুকুম তৈরি করেন না।

তাশ্‌রী'-এর দ্বিতীয় অর্থটি অর্থাৎ আইন ও বিধান রচনা করা ইজতিহাদের সমার্থক। এ ইজতিহাদ হচ্ছে, শরীয়ত উপস্থাপিত প্রমাণ সমূহের কোনো একটির ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান নির্মাণ করার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো। [১৪]

আর শরীয়ত বলতে আমরা যে কথাটি বুঝাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে, এমন সব শরয়ী বিধান যেগুলো নসের মাধ্যমে বা নস্ থেকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যয় বা ধারণাদীপ্ত বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম থেকে শরয়ী আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শরীয়তের কতিপয় বিধানের মধ্যে বিরোধ সহকারে

সমগ্র দীনী ব্যবস্থার ঐক্য

কুরআনের কতিপয় আয়াতে নবী রসূলগণের অভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে। আবার কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে তাদের ভিন্নতার কথা। এ আয়াতগুলোকে আমরা সামঞ্জস্যশীল করবো কিভাবে ?

প্রথম ধরনের বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে :

'তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো। তার মধ্যে মতভেদ করো না' [১৫]

'তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছিলেন, কাজেই তাদের পথ অনুসরণ করো।[১৫ক]

আবার দ্বিতীয় ধরনের আয়াতে বলা হয়েছে :

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ তৈরি করে দিয়েছি।"[১৬]

'তারপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের ওপর, কাজেই তুমি তার অনুসরণ করো।'[১৬ক]

এ উভয় ধরনের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি হচ্ছে: যেমন বলা হয়, প্রথম ধরনের আয়াতগুলো দীনের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত এবং দ্বিতীয় ধরনের আয়াতগুলো দীনের শাখা-প্রশাখার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইমাম কুরতুবী বলেন 'দীন প্রতিষ্ঠিত করো' এ বিষয়টি হচ্ছে– আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য করা। তাঁর রসূলগণও কিতাবের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং এক ব্যক্তির মুসলমান থাকার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সে সবের প্রতি ঈমান রাখা এবং মুসলিম উম্মতের কল্যাণার্থে নিবেদিত শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান না করা। শরীয়ত বিভিন্ন এবং তাদের মধ্যে দূরত্বও রয়েছে। [১৭]

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ও নূহ! তোমাদের আমি একই দীন তথা জীবন বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছি– তোমাদের এমন মূলনীতি মেনে চলতে হবে যার শরীয়ত বিভিন্ন হবে না। সেই শরীয়ত হচ্ছে : তাওহীদ, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, সৎকর্মশীলতা সহকারে আল্লাহর নৈকট্য, সত্যবাদিতা, অংগীকার পালন, আমানতদারী, আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা, কুফরী না করা, হত্যা না করা, যিনা না করা, আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়া, যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় না করা, জীবের প্রতি অত্যাচার না করা, হীনতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং সৌজন্যবোধ খতম না করা। এসবগুলোই একটি দীন ও ঐক্যবদ্ধ মিল্লাতের অন্তরভুক্ত

বিধিবদ্ধ বিধান। নবীদের সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ আছে কিন্তু তাদের এই একীভূত পদ্ধতির ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।[১৮]

এরপর বাহ্যিক শারীরিক কাঠামোর ন্যায় শরীয়ত বিভিন্ন হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ বিধৃত কল্যাণ এবং বিভিন্ন যুগের উম্মতের জন্য কর্মকৌশল। মুজাহিদ বলেন : আল্লাহ যাদেরকে নবী করে পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই হুকুম দিয়েছেন নামায কায়েম করার, যাকাত দেবার এবং আল্লাহর আনুগত্যের অংগীকার করার। এই দীনই আল্লাহ তাদের জন্য রচনা করেছেন।[১৯]

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে শরীয়ত দুই প্রকারের। তার মধ্যে এক প্রকার শরীয়ত অপরিবর্তনীয়। তার কোনো বিধান রহিত হয় না। বরং একে অপরিবর্তনীয় রাখাই অপরিহার্য। সকল নবীর দীন ও শরীয়তের মধ্যে এর এ অবস্থান চির নির্ধারিত। আবার দ্বিতীয় প্রকারের শরীয়তটি বিভিন্ন নবীর দীন ও শরীয়তের ভিত্তিতে বিভিন্ন। দ্বিতীয় প্রকারের শরীয়তটির তুলনায় প্রথম প্রকারের শরীয়তটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবার জন্য প্রথম ধরনের শরীয়তের ভিত্তিতে সময়ের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।[২০]

কাজেই নবীগণ আল্লাহর নিকট থেকে মূলত একই জিনিস এনেছেন। তার মধ্য থেকে স্থায়ী কল্যাণের সাথে জড়িত বিষয়গুলো স্থান কালের পরিবর্তনে নমনীয় হয়ে যায় না। যেমন ঈমান, নামায, ন্যায় বিচার, সত্যবাদিত কুফরী এবং জুলুম ও মিথ্যাচারের হারাম হওয়া ইত্যাদির অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আবার এর মধ্যে এমন কল্যাণকর বিষয় আছে যা স্থান-কাল-পাত্রের বিভিন্নতায় ও অবস্থার পরিবর্তনে নমনীয় হয়ে যায়। এই কল্যাণকর বিষয়গুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তার মধ্যে পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। নাসেখ মানসূখের ক্ষেত্রে উসূলবিদগণ এ সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাজেই দীনের মূলে রয়েছে ঐক্য ও একতা। শরীয়ত তথা আইন-কানুন ও পথ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক।[২১]

ইবনে কাইয়েম বলেন :[২২] সমস্ত শরীয়ত যদিও বিভিন্ন কিন্তু তাদের সবার মূলনীতি এক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৌন্দর্য্যের দিক দিয়েও তারা একীভূত। যদি তারা অন্যরকম হতো, তাহলে হয়ে পড়তো জ্ঞান, কল্যাণ ও রহমতশূন্য।[২৩]

শরয়ী বিধানের সংগা

আগেই বলা হয়েছে, শরীয়তের অর্থ হচ্ছে বিধিবদ্ধ অনুশাসন। শরীয়তের এ অর্থ নির্ধারিত হবার পর আমরা উসূলবিদগণের দৃষ্টিতে শরয়ী তথা বিধিবদ্ধ অনুশাসনের তাৎপর্য বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। এই সঙ্গে আল্লাহ নির্ধারিত শরীয়ত ও রচিত শরীয়ত (Positive Law) এই দুই প্রকার শরীয়ত এবং এদের শ্রেণী বিভাগেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

উসূলবিদগণ বলেন : আল্লাহ যেসব কাজ করার জন্য মানুষকে সম্বোধন করেছেন সেগুলো ফরয, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অথবা বাড়তি লাভ হিসাবে গণ্য।[২৪]

এ সম্বোধন হলো আসলে মানুষকে বুঝাবার জন্য তার কাছে বাণী পাঠানো তারপর তাকে বাণীর দিকে ফিরেয়ে দেয়া। আর আল্লাহ সম্বোধন করেন তাঁর নিজের শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে। এর সাথে মানুষের সম্পর্ক দুই রকমের : সৎকর্মশীলতার ও কার্যকর করণের। সৎকর্মশীলতার সম্পর্কের অর্থ হচ্ছে: কর্তব্য পালনের শর্তগুলো একত্র হয়ে গেলে মানুষ তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এটি একটি প্রাচীন সম্পর্ক। অন্যদিকে কার্যকর করণের সম্পর্কটি সাময়িক। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, নবীদের আগমনের এবং তাঁদের দাওয়াত পৌঁছে যাবার পর মানুষের কর্তব্য পালনের শর্তগুলো একত্র হয়ে যায়। এটিই এর প্রকৃত অর্থ। এখানে মানুষের ওপর কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চাপে। আর একজন সাবালক বুদ্ধিমান মানব সন্তানের কাছে এ দাওয়াত পৌঁছে যাবার পর তাকে কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। ফকীহ ও উসূলবিদগণ এ অর্থেই একে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে মানুষ তার আন্তরিক বিশ্বাস, কথা ও অন্যান্য মানবিক শক্তির মাধ্যমে কাজ করে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ 'রচনা' শব্দটির যে অর্থ করেছেন তা হচ্ছে : তাঁরা এ শব্দটিকে এর অর্থের ওপর প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। যেমন সন্তানের নাম রাখা হয় যায়েদ অর্থাৎ বৃদ্ধি হওয়া। এ প্রেক্ষিতে এখানে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ একটি জিনিসকে কার্যকারণ, শর্ত, সঠিক প্রতিবন্ধক অথবা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী করে রচনা করেছেন।

শরয়ী অনুশাসন দুই প্রকারের : 'তাকলীফী' তথা আল্লাহ নির্ধারিত শরীয়ত এবং রচিত শরীয়ত। এ উভয় প্রকার শরীয়তের প্রত্যেকটিই আবার বিভিন্ন প্রকারের। আল্লাহ নির্ধারিত শরীয়ত পাঁচ প্রকারের : ওয়াজিব, মানদুব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। কাজের দাবী যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ওয়াজিবে পরিণত হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছুলে তা হয় মানদুব। আবার কাজটি পরিহার করার দাবী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তা হারামে পরিণত হয়। এ দাবী চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছুলে তা হয় মাকরূহ। আর মানুষকে যখন কাজটি সম্পন্ন বা পরিহার করার ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হয় তখন তাকে বলা হয় মুবাহ। এভাবে আল্লাহ নির্ধারিত শরীয়ত পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।[২৫]

এগুলো থেকে যে কাংখিত কর্ম উৎপন্ন হয় তাকে সরাসরি দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি ওয়াজিব এবং দ্বিতীয়টি মানদুব। আর অন্যগুলোর মাধ্যমে যে অনাকাংখিত কর্ম পরিহার করা হয় তাকেও দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হারাম এবং অন্যটি মাকরূহ। আর এসব কর্ম সম্পন্ন ও পরিহার করার মাঝামাঝি যে এখতিয়ার রয়েছে সেটি হচ্ছে মুবাহ।

ওয়াজিব বলা হয় এমন কাজকে যা পরিহার করলে মানুষ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হয়। হারাম বলা হয় এমন কাজকে যা সম্পাদন করলে মানুষ শরীয়তের দৃষ্টিতে

নিন্দাভাজন হয় এবং পুর্বাহ্নিক সতর্কতা হিসাবে শরয়ী বিধান অনুসারে তাকে কারারুদ্ধ করা যায়। মানদুব বলা হয় এমন কাজকে শরীয়তের দৃষ্টিতে যা করাকে তার না করার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। এবং না করার জন্য সে নিন্দনীয় হয় না। মাকরুহ বলা হয় এমন কাজকে শরীয়তের দৃষ্টিতে যা পরিহার করাকে তার সম্পাদন করার ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় এবং তা সম্পাদন করলে নিন্দাভাজন হয় না। আর মুবাহ বলা হয় এমন কাজকে শরীয়তের দৃষ্টিতে যার উভয় পাল্লা সমান।

কাররাফী বলেন :[২৬] ফিকহের পরিভাষায় এ আল্লাহ নির্ধারিত অনুশাসনকে বলা হয়েছে 'তাক্‌লীফ'। কারণ এ তাক্‌লীফ শব্দটির মধ্যে রয়েছে কুলফাত। কুলফাত মানে হচ্ছে : মুশাক্‌কাত, দু:খ, কষ্ট ও অস্বাচ্ছন্দ্য। অর্থাৎ নির্ধারিত কাজটি ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে তা পরিহারকারী কষ্টভোগ করবে। অথবা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তা সম্পাদনকারী কষ্ট ভোগ করবে। আর এ দু'টি অবস্থা ছাড়া এর সম্পাদনকারী বা পরিহারকারীকে কষ্টভোগ করতে হবে না। কারণ কুলফাত তথা দু:খ-কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শাস্তি। এ দু'টি অবস্থা ছাড়া এ শাস্তি নেই। এ কারণে বলা হয় : শিশুরা মুকাল্লাফ নয় অর্থাৎ তাদের শাস্তি নেই। যদিও তাদের হজ্জ সম্পাদন করা মানদুব হিসাবে গণ্য। আর তাদের নামায পড়া একটি সঠিক কাজ। কাজেই 'তাকলীফ' শব্দটি সহনীয়তা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি অর্থে শেষোক্ত তিনটির তুলনায় প্রথমোক্ত দুটির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।[২৭]

রচিত শরয়ী বিধানের বিভিন্ন প্রকরণ

মানুষের কাজের ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণয়নকারীর বিধান কখনো দাবী হিসাবে আবার কখনো এখতিয়ার হিসাবে প্রদত্ত হয়। এগুলো তাঁর নির্ধারিত বিধান একথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আবার কখনো এগুলো কোনো কিছুর কার্যকারণ, শর্ত বা প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়। তখন এগুলো হয় রচিত বিধান (Positive Law) কোনো কোনো ফকীহ রচিত বিধানের ব্যাপারে বলেন : এগুলো কোনো জিনিসকে বা কাজকে সহী (সঠিক), ফাসেদ (বেঠিক), আযীমত (অবিচলতা) ও রুখসাতে (না করার অনুমতি) পরিণত করে।[২৮]

শরীয়তের বিধানসমূহ কার্যকারণ, শর্ত ও প্রতিবন্ধকের অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে। মহান আল্লাহ বিধান সমূহ রচনা করেছেন এবং তাদের জন্য তৈরি করেছেন বিভিন্ন কার্যকারণ, শর্ত ও প্রতিবন্ধক। মানুষের ওপর আল্লাহ যে কর্মের দায়িত্ব চাপিয়েছেন তা দুই প্রকারের। এক. তাকলীফী কর্ম। একে মানুষের জ্ঞান ও শক্তির শর্তাধীন করেছেন। দুই. রচিত কর্ম। একে ঐ ধরনের কোনো শর্তাধীন করেন নি। তবে এ ধরনের কর্ম বহুতর কার্যকারণ, শর্ত ও প্রতিবন্ধকের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো তার মধ্যে সাধারণভাবে নেই। তাই রচিত বিধানে পাগল ও গাফিলদের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে অনিষ্ট হতে পারে বলে তাদের জন্য গ্যারান্টি অপরিহার্য গণ্য করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় যেমন

মহান আল্লাহ বলছেন : যখন বাস্তবে গ্যারান্টি পাওয়া যাবে তখন আমার হুকুম কার্যকর করতে হবে। ঋটতি তালাক দেয়া ও আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে মীরাস বণ্টনও এর অন্তরভুক্ত। কখনো কখনো একে জ্ঞানের শর্তাধীন করা হয়। যেমন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যিনাকারীর শপথ করে বলা এবং হত্যার বদলে হত্যা। কারণ যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার সংকল্প করে নি, সে এ ব্যাপারে জানতোও না এবং তার অংশগ্রহণ ছাড়াই তা সম্পন্ন হয়েছে, সে যাতে শাস্তি না পায় সে ব্যাপারে শরীয়তের আইন অবশ্যই সজাগ।

এ জন্য যেসব অপরাধমূলক কাজের শাস্তি স্বরূপ জামানতের ভিত্তিতে জরিমানা করা হয় সেগুলো ছাড়া প্রত্যেকটি মারাত্মক অপরাধ, যা সংঘটিত হয়, তার কার্যকারণের সাথে জ্ঞান ও সামর্থের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, এ কারণে ফকীহগণ বলেন : জনগণের অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে জেনে বুঝে বা ভুলে কোনো অপরাধ করা সমপর্যায়ভুক্ত।[২৯]

কার্যকারণ হচ্ছে : যার অস্তিত্বের ওপর কাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয় এবং যার অনস্তিত্বের ফলে কাজটি অস্তিত্বহীন হয়।

শর্ত হচ্ছে : যার অস্তিত্বহীনতার ফলে কাজটি অস্তিত্বহীন হয় এবং যার অস্তিত্বের ফলে কাজটির অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে না।

প্রতিবন্ধক হচ্ছে : যার অস্তিত্ব কাজটির অনস্তিত্বকে অনিবার্য করে এবং যার অনস্তিত্বের ফলে কাজটির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অনিবার্য হয় না।

এ তিনটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাবকে কার্যকারণ হিসাবে স্থির করা হয়েছে, একটি বর্ষকাল অতিক্রম হওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঋণকে তার ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নির্ণয় করা হয়েছে। কাজেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অর্থ-সম্পদের নিসাবের অধিকারী হতে হবে, তার ওপর দিয়ে একটি বছর ঘুরে যেতে হবে এবং তাকে ঋণমুক্ত থাকতে হবে।

কার্যকারণকে হুকুমের জন্য আরো বেশি ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে তার সংগা যাকে অপরিহার্য করে তোলে না সে ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়াকে নামায ফরয হওয়ার আলামত নির্ধারণ করা। আবার শরীয়তের জন্য যা তাকে অপরিহার্য করে তোলে সে ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন মদের উপর কিয়াস করে 'নাবীযে তামার' (খেজুর ভিজানো পানি যা পান করলে নেশা হয়) হারাম হওয়ার জন্য পরিচিত কড়া গান-বাজনাকে কার্যকারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ মদ পান হারাম হওয়ার জন্য একে কার্যকারণ চিহ্নিত করা হয় নি। কারণ সুস্পষ্ট 'নস্' ও ইজমার ভিত্তিতে মদপান হারাম, কড়া গান-বাজনার ভিত্তিতে নয়।

কার্যকারণের ভিত্তিতে যার উপর হুকুম প্রয়োগ করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম প্রকৃত গুণের অধিকারী নয়। বরং প্রকৃত গুণের অধিকারী হচ্ছে তার প্রতি কার্যকারণের ভিত্তিতে শরীয়তের হুকুম। এভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা, তার মধ্যকার হুকুমকে নিমিত্তের

ভিত্তিতে হুকুম চিহ্নিত করে, অন্য কোনো শ্রুত প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। তার মধ্যে দুটি হুকুম রয়েছে। এক. কার্যকারণের সাথে চিহ্নিত হুকুম। দুই. প্রকৃত গুণের ভিত্তিতে যে হুকুম করা হয়েছে তার সাথে জড়িত কার্যকারণ। যেমন যিনা, তার মধ্যে দুটি হুকুম রয়েছে : এক. যিনাকারীর ওপর 'হদ' (অপরাধ দণ্ডবিধি) ওয়াজিব হয়ে যায়। দুই. যিনা যিনাকারীর ওপর 'হদ' জারী করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রকৃতপক্ষে যিনার মধ্যে যিনাকারীর ওপর হদ জারী করার কোন 'কারণ' মওজুদ নেই বরং শরীয়ত প্রণেতা তার ওপর হদ জারী করার ফলেই তার মধ্যে এ কারণ সৃষ্টি হয়ে গেছে।[৩০]

কার্যকারণকে যখন হুকুমের সাথে চিহ্নিত করা হয় তখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় না যে, সে নিজের সত্তা ও গুণের জন্য নিজেকে অপরিহার্য করে তোলে। তবে শরীয়তের বিধান উপস্থিত হবার পূর্বে সে তার কারণে পরিণত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, শরীয়ত প্রণেতা কোনো হুকুমকে হুকুমে পরিণত করেন, অন্য কেউ নয়। আর কার্যকারণকে চিহ্নিত করে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে যে লাভটি হয়েছে তা হচ্ছে অহীর জামানা খতম হয়ে যাওয়ার পর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনায় মানুষের ওপর শরীয়তের নির্দেশ জারী হওয়ার ক্ষেত্রে কঠিনতা সৃষ্টি হয়েছে।এ ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা বিভিন্ন ঘটনাকে শরীয়তের নির্দেশ বহির্ভূত করার জন্য পরিচিত গুণাবলীকে সতর্ক ঘণ্টায় পরিণত করেছেন। এ অবস্থায় কার্যকারণ যতবারই দেখা যাবে ততবারই হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন সূর্য ঢলে পড়া, প্রথমীর চাঁদ উদিত হওয়া, একটি বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি কার্যকারণ।[৩১]

ফকীহগণ কার্যকারণ শব্দটির চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন :

প্রথম স্তর : প্রত্যক্ষের মোকাবিলায় তাকে ব্যবহার করা। যখন তাকে ব্যবহার করা হয় প্রত্যক্ষের মোকাবিলায় তখন তা থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হয় নিছক শর্ত। এ শব্দটিকে জামিনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে : প্রত্যক্ষের পক্ষে জামিন প্রয়োজন কারণসূচকের পক্ষে নয়। এখানে প্রত্যক্ষের জন্য নিমিত্ত থাকতে হবে এবং কারণসূচকের জন্য থাকতে হবে শর্ত। বলা হয় : পশুর পায়ের খুর হচ্ছে কারণসূচক এবং কুঠার প্রত্যক্ষ। আর যে ব্যক্তি দাসের বাঁধন খুলে দিল যার ফলে সে পালিয়ে গেল, সে ক্ষেত্রে সে হলো কারণসূচক এবং দাস হলো প্রত্যক্ষ। এ ক্ষেত্রে হুকুম অর্জিত হয়েছে বাঁধন খুলে দিয়ে পলায়ন করার মাধ্যমে, কেবল বাঁধন খুলে দেবার মাধ্যমে নয়। বলা হয় : পবিত্রতা অর্জিত হয় রজমের মাধ্যমে। এখানে রজম পরিণত হয় শর্তে। এটি এর শাব্দিক অর্থ ব্যবহারের নিকটতম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর : এটি হচ্ছে কারণের নিমিত্তের নিমিত্ত। যেমন তীর নিক্ষেপ করা। এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে : এটা মৃত্যুর কারণ। কেন না তীর নিক্ষেপের ফল মৃত্যু হয়। এই স্তরে পৌছার জন্য তীর নিক্ষেপটা কার্যকারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু শরীরের ভিতরে অনুপ্রবেশ করা ও আঘাত লাগার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে তীর নিক্ষেপের ফলে তাই অর্জিত হয়েছে। ফলে তীর নিক্ষেপটা যেন নিমিত্তের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ

জন্য এই দুই স্তরের একটির সাথে এর অর্থ সামঞ্জস্যশীল হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে, নিমিত্তের মাধ্যম ছাড়া এর হুকুম অর্জিত হবে না। যেমন রাস্তায় পৌঁছানো সম্ভব নয় নিমিত্তের মাধ্যম ছাড়া। তবে ভ্রমণ রাস্তা অতিক্রম করার ফল নয়। এখানে নিমিত্তটি অর্জিত হয়েছে কার্যকারণের সাহায্যে। কার্যকারণের এই শ্রেণীটি হুকুমের বাধ্যবাধকতার প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যক্ষ হুকুমের অধিকারী হয়।

তৃতীয় স্তর : এটি হচ্ছে নিমিত্তওয়ালা, এর পেছনে থাকে গুণাবলী হিসাবে কার্যকারণ। এর নামকরণ এভাবে করা হয়েছে : কাফফারার জন্য শপথ, কার্যকারণ হিসাবে। একে এ নামকরণও করা হয়েছে : নিসাবের মালিক, কার্যকারণ হিসাবে, শপথ ভংগ না করে এবং বছর পার না করে। এভাবে রূপকের মাধ্যমে একে পেশ করার অর্থ হলো, নিছক তার সাহায্যে হুকুম অর্জিত হয় না যেমন নিছক পথের সাহায্যে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না।[৩২]

চতুর্থ স্তর : এমন অপরিহার্য নিমিত্ত যা কার্যকারণে পরিণত হয়। যেমন প্রেম, শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের নিমিত্তের নামকরণ করা হয়েছে : কার্যকারণ। কেনাবেচার কারণের নামকরণ করা হয়েছে : মালিকের জন্য কার্যকারণ অমালিকের প্রতি। এটি হচ্ছে শাব্দিক কাঠামো থেকে রূপক অর্থে দূরবর্তী স্তর। কারণ এখানে উদ্দেশ্য কারণের সাথে সম্পর্কিত এবং কাঠামোর মধ্যে কার্যকারণের সাথে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু প্রত্যেক স্তর থেকে শর্ত ও আলামতের অর্থের মধ্যে যে শরয়ী কারণ থাকে সেটিই রূপকের স্তর। কারণ তার সত্তার সাহায্যে হুকুম ওয়াজিব হয় না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম ওয়াজিব হয়। এই স্তর থেকেই রূপক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।[৩৩]

কাররাফী তাঁর 'তানকীহুল ফুসূল' গ্রন্থে বলেছেন : তার জন্য শর্ত হচ্ছে, নিমিত্তের অংশের সাথে তার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, নিমিত্তের অংশ তার সত্তার উপযোগী, অন্যদিকে শর্ত হচ্ছে অন্যের উপযোগী। নিমিত্তের অংশের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন জেনেবুঝে জালেমানা হত্যার কিসাস। কারণ তিনটি হচ্ছে কিসাসের কার্যকারণ। এদের প্রত্যেকটি কারণের অংশ। কারণ তাদের কোনোটিকে আবার আমরা স্বতন্ত্রভাবে কিসাস ওয়াজিব হবার ফলে পাই না। আর যদি তাদের কোনোটিকে স্বতন্ত্র হুকুমের মাধ্যমে পাই তাহলে তাদের প্রত্যেকটিই হবে স্বতন্ত্র নিমিত্ত। হুকুমের ব্যবস্থাপনাকে একত্র করা হলে যদি তাদের কোনোটি স্বতন্ত্র হয়ে যায় তাহলেও হুকুম কার্যকর হবে। যেমন কুমারীত্ব ও শক্তি প্রয়োগ সাপেক্ষে নাবালিকত্ব। যদি এ দুটি একত্র হয়ে যায় তাহলে পিতা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। আর যদি এদের কোনো একটি আলাদা হয়ে যায় যেমন বিবাহিতা নাবালিকা অথবা অবিবাহিতা কুমারী তাহলে তার জন্য শক্তি প্রয়োগ বৈধ। তবে এ ব্যাপারে হানাফীয়া ও শাফেয়ীয়াদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

এ ক্ষেত্রে যখন সবকিছু উপযোগী হয় তখন সেখানে কোনো শর্ত থাকে না বরং থাকে একটি বা একাধিক নিমিত্ত। আর যদি কিছু অংশ উপযোগী হয় এবং কিছু অংশ হয়

অনুপযোগী তখন উপযোগী অংশ হয় নিমিত্ত এবং অনুপযোগী অংশ হয় শর্ত। আর এ শর্ত হয় সত্তার ওপর হুকুমের নির্ভরতার প্রয়োজনে। শর্তের আচরণের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সূচকের কৌশলের জন্য পূর্ণতাকারী অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এটা নিসাবের অংশের মতো। কারণ এটা হচ্ছে ধনীর সম্পদের কিছু অংশ। দরিদ্রদেরকে এর মাধ্যমে সান্ত্বনা দেয়া যায়। বছর ঘুরে যাবার সময় তার মধ্যে সম্পদশালিতা থাকে না। তবে তা নিসাবের উপযোগী সম্পদশালিতাকে পূর্ণতা দান করে। ফলে তা শর্তে পরিণত হয়।[৩৪]

শরয়ী প্রতিবন্ধক তিন প্রকারের

এক. হুকুমের সূচনা ও তার ধারাবাহিকতাকে যা বাধা দেয়।

দুই. যা কেবল তার সূচনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

তিন. প্রথমটি দ্বিতীয়টির সাথে সম্পৃক্ত হবে কি না এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

প্রথমটির দৃষ্টান্ত : যেমন রিদা'য়াত বা শিশুকে দুধপান করানো। এর ফলে প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ রিদায়ী ভাইবোনের মধ্যে যেমন বিয়ে নিষিদ্ধ তেমনি অনাকাংখিতভাবে তা ঘটে গেলে তাকে টিকিয়ে রাখাও নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হচ্ছে : ইসতারুরা বা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আলাদা হতে চাওয়া। এর ফলে প্রাথমিক পর্বেই বিয়ে নিষিদ্ধ এবং তা ঘটে গেলে তার ধারাবাহিকতাকে বাতিল করা হবে না। আর তৃতীয়টির দৃষ্টান্ত হচ্ছে : ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা। প্রাথমিক পর্বেই এটি নিষিদ্ধ এবং কোনোক্রমে মুহরিম শিকার করে ফেললে শিকার করা জীব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া ওয়াজিব কি না? এ প্রশ্নে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৩৫]

সঠিক ও বাতিল

'সঠিক' শব্দটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি হচ্ছে, দুনিয়ায় কর্মের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা। যেমন আমরা ইবাদাত সংক্রান্ত ব্যাপারে বলে থাকি যে, এগুলো সঠিক ইবাদত। এর অর্থ হয়, এগুলো সংরক্ষণ করলে প্রতিদান দেয় ও ত্রুটিমুক্ত করে এবং সঠিক লক্ষে পৌছিয়ে দেয়। এটি হবে শর্ত ও আরকান সহকারে শরীয়ত প্রণেতার হুকুম অনুসরণ করা। আর যেমন লেনদেনের ব্যাপারে বলা হয়, এটি সঠিক লেনদেন। এর অর্থ হয় : শরীয়তের দিক দিয়ে মালিকানা ও হালাল হবার ক্ষেত্রে এটি কল্যাণকর। যেমন বেচাকেনা ও ইজারাদারী।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আখেরাতে কর্মফল। যেমন সওয়া'ব লাভ করা। বলা হয় : এটি সঠিক আমল। অর্থাৎ এ থেকে আখেরাতে সওয়াবের আশা করা যায়, এটি ইবাদত বা অভ্যাস হিসাবে করা হলেও।[৩৬]

অন্যদিকে 'বাতিল বলতে' বুঝায় দুনিয়ায় কাজের প্রভাব ও ফল অনুষ্ঠিত না হওয়া। যেমন ইবাদতের ব্যাপারে আমরা বলি, এ ইবাদতটি বাতিল হয়ে গেছে। এর অর্থ হয়, এটি সংরক্ষণ করলে প্রতিদান দেয় না ও ত্রুটিমুক্ত করে না এবং সঠিক লক্ষে পৌছিয়ে দেয় না। এটি হবে শরীয়ত প্রণেতার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা। এ বিরোধিতা যখন প্রযুক্ত হয় ইবাদতের সাথে তখন বাতিল শব্দটি তার ওপর প্রয়োগ করার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ দেখা যায় না। এটি যখন বাইরের কোনো গুণের সাথে প্রযুক্ত হয়, যা তার প্রকৃত তাৎপর্য থেকে দূরে অবস্থান করে, যেমন জবর দখল করা বা অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া কোনো জায়গায় নামায পড়া। এ ক্ষেত্রে জমহুরের মতে নামায সঠিক হবে। কারণ শরীয়ত প্রণেতার রীতি অনুযায়ী নামায পড়া হয়েছে। বিরোধিতা এ ক্ষেত্রে নামাযের গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে নি। তবে কোনো কোনো ফকীহ্ একে বাতিল গণ্য করেছেন। কারণ তারা একে শরীয়ত প্রণেতার হুকুমের গুণগত বিরোধিতা হিসাবে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে ছিনিয়ে নেয়া বা কারোর কাছ থেকে বলপূর্বক কেড়ে নেয়া ছুরি দিয়ে যবেহ করার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়।

লেনদেন প্রধানত যখন দুনিয়াবী স্বার্থভিত্তিক হয় তখন সেখানে দুটি বিবেচনা সামনে আসে। এক. সেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমোদিত অথবা নির্দেশিত বিষয়। দুই. সেগুলো বিভিন্ন কল্যাণ বা স্বার্থের কার্যকারণ, যেগুলোর ভিত্তি তাদের ওপর স্থাপিত হয়েছে। প্রথম বিবেচনাটি যে দল করেছেন তাদের মতে এখানে শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। যেমন নিছক ইবাদতের ক্ষেত্রে। এ অবস্থায় শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশের বিরোধিতার ফলে তা শরীয়ত বিরোধী হয়ে যায় এবং শরীয়ত বিরোধী বিষয় বাতিল হিসাবে গণ্য। এ ক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ বলেন : ফাসেদ ও বাতিল লেনদেনের মধ্যে কোনো ফারাক নেই, ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন এ কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবেচনাটি যারা করেছেন তারা প্রথম বিষয়টির পরোয়া করেন নি বরং তাঁরা বিষয়টিকে কল্যাণ বা স্বার্থের বিবেচনার ভিত্তিতে প্রয়োগ করেছেন।

এ অর্থের ভিত্তিতে কখনো এর কাজ হয় হুকুমের বিরোধী এবং আসল চুক্তি বা কার্যক্রমে তার প্রভাব পড়ে। যেমন পাগলের বেচাকেনা এবং মুসলিম মেয়ের বিয়ে কাফেরের সাথে। এগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। আবার কখনো অর্থের ভিত্তিতে কাজ হয় বিরোধী এবং তা আসল চুক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলে না, তবে তার গুণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ক্ষতিপূরণ সম্ভবপর হয়। যেমন অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বা অজ্ঞাত মূল্যের বিনিময়ে বেচাকেনা। এ ক্ষেত্রে কাজটি বাতিল হওয়া সম্ভব নয়। বরং চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় ক্ষতিপূরণ প্রদানে নির্দেশিত হয়। এ অর্থটি কখনো শরীয়ত নির্ধারিত সময় সীমার বিরোধী গুণকে সরিয়ে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো চুক্তি বাতিল করে দেয় যদি তা গ্রহণ করে নেয়া হয়। হানাফীগণ একে ফাসেদ চুক্তি গন্য করেছেন। আর তাদের দৃষ্টিতে 'বাতিল' হচ্ছে এমন চুক্তি যা আসলে গুণগতভাবে শুরু হয় নি। অন্যদিকে 'ফাসেদ' হচ্ছে এমন চুক্তি যা গুণগতভাবে না হলেও আসলে শুরু হয়েছিল। যেমন সূদী বেচাকেনার চুক্তি। কারণ তা বেচাকেনা হিসাবেই শুরু হয় এবং নিষিদ্ধ হয়ে

যায় এ কারণে যে, বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই এটা আসলে ও গুণগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায় এ কারণে যে, বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই এটা আসলে ও গুণগতভাবে নিষিদ্ধ এবং গুণগতভাবে নয় বরং আসলে বৈধ এর মাঝখানে একটি পর্যায়ের দাবি করে। এ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিতে হুকুমের ব্যবহারটাই ফাসেদ, হুকুম বাতিল হওয়াটা নয়।

শাফেয়ীগণ বাতিল ও ফাসেদ সম্পর্কে যে ধারনা পোষণ করেন এটা তার বিপরীত। তাদের দৃষ্টিতে এ দুটির একই অর্থ।

আযীমাত ও রুখসাতের ক্ষেত্রে হুকুমের বিভিন্নতা

আযীমাত শব্দটি এসেছে আযম থেকে। আযম অর্থ দৃঢ় সংকল্প। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অর্থ হচ্ছে : যা সূচনাতেই শরীয়তের সাধারণ প্রচলিত হুকুম হিসাবেই শুরু হয়েছিল। সাধারণ হুকুম অর্থ হচ্ছে : যা দায়িত্ব পালন অর্থে কেবল বিশেষ কিছু দায়িত্বশীলের সাথে এবং বিশেষ কিছু অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন নয়। যেমন নামায। নামায সাধারণভাবে সবার ও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এবং সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে রোযা, যাকাত ও হজ্জ। অন্যদিকে ইসলামের 'শিআর' তথা ঐতিহ্যগুলো শরীয়তের বিশেষ বিষয়াবলী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে।

আর 'সূচনাতে শরীয়তী বিধান হিসাবে এর প্রচলন অর্থ হচ্ছে, শরীয়ত প্রণেতা শুরু থেকেই বান্দাদের ওপর ফরয হুকুম হিসাবে এগুলোর প্রচলন করেছেন। এর পূর্বে শরীয়তের কোনো হুকুম এর অগ্রবর্তী ছিল না। যদি অগ্রবর্তী কোনো হুকুম থেকে থাকে তাহলে এটি এসে তাকে রহিত করে দিয়েছে। ফলে এটি প্রাথমিক হুকুমে পরিণত হয়েছে এবং এ থেকে কোনো কিছুকে বিশিষ্টতা প্রদান করা হয় নি।[৩৭]

অন্যদিকে রুখসাত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : সহজ ও অনায়াস। ইমাম গায্যালী এর সংগা এভাবে নির্দেশ করেছেন : দায়িত্ব পালনকারীর কোনো ওজর ও অক্ষমতার কারণে তার দায়িত্ব পালনকে সহজ করে দেয়া এবং তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা।[৩৮] কাজেই মারাত্মক ওজরের ভিত্তিতে রুখসাত শুরু হয়। মূল থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে তাকে ধরা হয় এবং প্রয়োজন পুরনের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্তও করা হয়। মারাত্মক ওজর তাকে আযীমত থেকে আলাদা করে দেয়। আর তার 'মারাত্মক ও কঠিন' হওয়ার ফলে উপস্থিত অনায়াসলব্ধ প্রয়োজন থেকে নিছক প্রয়োজনকে বের করে দেয়। যেমন সাল্ম* ব্যবসা করা। উসূলবিদগণ একে রুখ্সাত বলেননি। আর এর আসল থেকে ব্যতিক্রম হওয়া একথা বলে যে, প্রথমে এটা বিধিবদ্ধ ছিল না, আসল হুকুম স্থিতি লাভ করার পর বিধিবদ্ধ হয়। বাকি থাকে রুখসাতের ক্ষেত্রে তার সংক্ষিপ্ত হওয়া। এটা রুখসাতের এমন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট যা বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ প্রয়োজন ও রুখসাতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। রুখসাতের বিধিবদ্ধতা একটা আংশিক বিষয়, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

---

* *সাল্ম ব্যবসায়ের নিয়ম হলো– পণ্যের মূল্য নগদ আদায় করা হয় এবং পণ্য পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে।*

সাল্‌ম ব্যবসায়ে ও মুদারিবায়# তা হয় না। এ দু'টি সর্বাবস্থায় জায়েয। কাজেই আযীমত পরিপূর্ণ মূলের দিকে শুরুতেই ফিরে আসে। অন্যদিকে রুখ্‌সাত ফিরে আসে পরিপূর্ণ মূল থেকে আলাদা হয়ে অংশ বিশেষের দিকে।[৩৯]

শরীয়তের উৎসসমূহ বা আহকাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী

শরীয়তের হুকুমের সংগা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে আমরা বলেছি : এখানে আল্লাহর সম্বোধন দায়িত্বশীলদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে প্রতিপাদ্য হয় যে, শরীয়তের আহকাম বা বিধানসমূহ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ নয়।

আহকাম সম্পর্কিত আমাদের বক্তব্য সমূহকে সংক্ষেপে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করা যায়।

এক. শরীয়ত এমন কোনো দায়িত্ব ভার অর্পণ করে নি যা বহন করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

দুই. দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়া শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়।

তিন : মু'তাযিলা ও আহলি সুন্নাতের দৃষ্টিতে ভালো ও মন্দ বিষয়াবলী।

প্রথম বিষয়

কুরআন ও সুন্নাহর মূল নীতির ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, দায়িত্ব পালনকারীর কাজ করার ক্ষমতাই তার দায়িত্ব পালনের শর্ত ও কারণ হিসাবে বিবেচিত। যে কাজটি করার তার ক্ষমতা নেই শরীয়তের দিক দিয়ে সেটি করার দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়া সঠিক নয়, যদিও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তা বৈধ। যে কাজটি করার ক্ষমতা মানুষের নেই কখনো আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে শরীয়ত প্রণেতা যেন মানুষকে সেটি করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন : 'তোমরা কখনো মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'[৪১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

'আল্লাহর নিহত বান্দা হও, হত্যাকারী বান্দা হয়ো না।'[৪২] তিনি আরো বলেন : জালেম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।[৪৩] এখানে আসলে সেটিই চাওয়া হয়েছে যা মানুষের শক্তির আওতাভুক্ত। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা ও ইসলামের আহকাম মেনে চলা এবং জুলুম পরিহার করা, হত্যা না করা ও আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়া। এ ধরনের সমস্ত বিষয় এ পর্যায়ভুক্ত।

অনুরূপভাবে মানুষের স্বভাবজাত গুণাবলী যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, এগুলো বিলুপ্ত করা বা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে এগুলোকে সরিয়ে দেয়া কখনো কাংখিত হয় না। কারণ এগুলো এমন সব চাহিদা ও দায়িত্ব যেগুলো খতম করার ক্ষমতা মানুষের নেই। ঠিক তেমনি মানুষের শরীরের মধ্যে যে প্রকৃতিগত দোষ ত্রুটি আছে সেগুলোকে গুণাবলী

 # আর মুদারিবা এমন এক ধরনের ব্যবসায় যেখানে একজন পুঁজি বিনিয়োগ করে অন্যজন করে মেহনত এবং লাভে উভয় শরীক হয়।

হিসাবে প্রকাশ করা বা দোষগুলোকে ষোলকলায় পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা কাংখিত নয়। কারণ এগুলো মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

এ ধরনের বিষয় দাবী বা নিষিদ্ধ করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনি মানুষের কামনা বাসনাকে যেসব বিষয় হালাল নয় সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখতে ও দমন করতে চান। হালাল জিনিস তাকে প্রয়োজনমতো ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে সরবরাহ করতে চান। মানুষ কর্মের মাধ্যমে যেসব গুণাবলী অর্জন করতে পারে এগুলো তার অন্তরভুক্ত।[৪৪]

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানুষের জন্য কাংখিত গুণাবলী মূলত তিন প্রকারের।

এক. যে গুলো কোনো ক্রমেই মানুষের অর্জন ক্ষমতার আওতাভুক্ত নয়। এগুলো স্বল্প সংখ্যক। যেমন মহান আল্লাহর বাণী 'তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' এখানে মৃত্যুবরণ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। কাজেই এখানে কাংখিত বিষয় হচ্ছে তাই যা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে আছে অর্থাৎ আল্লাহর পূর্ণ অনুগত বান্দা হয়ে যাওয়া।

দুই. যেগুলো পুরোপুরি মানুষের অর্জন ক্ষমতার আওতাভুক্ত। মানুষের বেশির ভাগ কাজ এর অন্তরভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষ প্রচেষ্টা চালালে সেগুলি অর্জন করতে পারে। এখানে কাংখিত হচ্ছে, নিজের বা অন্যের জন্য হোক অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হওয়া।

তিন. যার হুকুম কখনো কখনো সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন ভালোবাসা, ঘৃণা, কাপুরুষতা-সাহসিকতা, ক্রোধ ইত্যাদি। এগুলো মানুষের অভ্যন্তরে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের প্রকৃতির সাথে এগুলো মিশে আছে। কাজেই এগুলোর অধীন হয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে যে গুণাবলী আছে, অবশ্যই তাদের অধীনে মানুষকে বিভিন্ন কাজ করতে হবে। কাজেই সেই কাজগুলোর ওপর চাহিদা নির্ভরশীল হবে, তা থেকে যা উৎপন্ন হবে তার ওপর নয়। অথবা এগুলো অন্যের উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রসূত হয়। উত্তেজনা বশত তার মধ্যে এগুলো উৎপন্ন হয়। কাজেই অন্য ধরনের কাজ করার চাহিদা নিয়ে এগুলোর আগমন হয়।

তার উত্তেজক যদি পূর্বগামী এবং তার সোপার্জিত হয়, তাহলে তার চাহিদা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'পরস্পর উপহার আদান প্রদান করো, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।[৪৬] আর যেমন যেদিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয নয় সে দিকে কামণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আর যদি তার উত্তেজক তার সোপার্জিত না হয়, তাহলে তার সাথে সংশ্লিষ্টদের চাহিদা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে। যেমন উত্তেজকের ক্রোধ প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুই রানের মাঝখানে দৃষ্টি ফেলো।[৪৭]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি, যে কাজ দায়িত্বশীলের ক্ষমতার আওতায় পড়ে না, আল্লাহ তার জন্য তাকে দায়ী করেন না। কারণ এর মধ্যে রয়েছে বাস্তবে যে কাজ করার ক্ষমতা তার নেই তার জন্য নিজেকে দায়ী করা। আর 'আল্লাহ ক্ষমতার বাইরে কোনো ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য দায়ী করেন না'। কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি সুস্পষ্ট শরয়ী বিধান।

দ্বিতীয় বিষয়

ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে তাকে কষ্ট দেয়া শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি, যে কাজটি ব্যক্তির ক্ষমতার আওতায় পড়ে না শরীয়তের দৃষ্টিতে সে কাজটি করা তার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত নয়। তা ছাড়া পূর্ববর্তী শরীয়তগুলো থেকেও ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবার কথাও প্রমাণিত নয়। এখন এই পর্যালোচনার পর ক্ষমতার আওতায় পড়ে কিন্তু করা কষ্টকর এমন ধরনের কাজের আলোচনায় আসতে হয়। কারণ যে কাজ করার ক্ষমতা নেই তা করার জন্য কষ্ট দেয়া শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়। এই কষ্ট কয়েক প্রকারের।

কষ্ট শব্দটি আরবী ভাষায় যেভাবে ব্যবহার হয় তা থেকে বুঝা যায় যে, কোনো বিষয় বা কোনো কাজ করা যখন খুব কঠিন হয় এবং এই কঠিনতা ব্যক্তির পিছু নিতে থাকে তখন তাকে কষ্টকর বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

'যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ও কষ্ট ছাড়া তোমরা পৌঁছুতে পারতে না।'

আরবী বাগধারায় সাধারণত এর চার ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায় :

প্রথম ব্যবহার : আয়ত্তাধীন ও তার বাইরের সব বিষয়ের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার হয়। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার বাইরে হলেই তাকে কষ্টকর বলা হয়। যেমন কুঁজোর সোজা হয়ে দাঁড়ানো, মানুষের হাত-পা ছড়িয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ানো এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয়।

দ্বিতীয় ব্যবহার : আয়ত্তাধীন বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে তা চিরাচরিত কাজের বাইরে থাকে, এমন অবস্থায় যে, তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করে এবং তাকে চাপিয়ে দিলে কষ্ট বেড়ে যায়।

এ ব্যবহারটি দু'প্রকারের। এবং এটি হচ্ছে, ব্যক্তির কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিশেষ কষ্ট। কাজটি একবার করা হলে কষ্টই দেখা যায়। এ জন্য এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে, যা ফকীহদের বহুল প্রচলিত পরিভাষায় রুখসাত নামে পরিচিত। যেমন রুগ্ন অবস্থায় ও সফরে রোযা রাখার কষ্ট, সফরে রোযা সম্পূর্ণ করা এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন কাজ।

দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে, সমগ্র কাজের ভিত্তিতে। একবার নয় বরং নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে তা করতে থাকার ভিত্তিতে কষ্ট। এভাবে কাজ করলে যে করে তার জন্য কষ্টকর হয়।

নফলের ব্যাপারে এগুলো দেখা যায়। যে ধরনের নফল কাজ করার ক্ষমতা ব্যক্তির নেই যে কোনো কারণেই হোক না কেন যখন নিজের ওপর তা চাপিয়ে নেয় তখন এ ধরনের কষ্ট হয়। কারণ স্থায়ীত্বই তাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে। প্রথম প্রকার অনুযায়ী একবার করার পর সে যে কষ্টের সম্মুখীন হয় বারবার তার সম্মুখীন হতে থাকে। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে শরীয়ত কোমলতার বিধান আরোপ করেছে এবং দু:খ কষ্টের মধ্যে পড়তে না হয় এমন কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'এমন কাজ করো যা করার ক্ষমতা তোমার আছে। কেন না তোমরা দু:খভারাক্রান্ত না হলে আল্লাহ তোমাদের দু:খভারাক্রান্ত করেন না।'[৪৯] তিনি আরো বলেছেন : 'তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, মধ্যপন্থা তোমাদের লক্ষে পৌছিয়ে দেবে।[৫০]

এ কষ্টটা দেখা দেয় সম্পূর্ণ কাজের ভিত্তিতে এবং প্রথম প্রকারের মধ্যে যে কষ্টের কথা বলা হয়েছে তা দেখা দেয় আংশিক কাজের ভিত্তিতে।

তৃতীয় ব্যবহার : আয়ত্তাধীন বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যক্তির নিয়মিত কাজের ফলে যে কষ্ট হয় তার কোনো প্রভাব এর ওপর পড়ে না। কিন্তু দায়িত্বের বোঝা চাপার পূর্বে যে নিয়ম ও অভ্যাস গড়ে ওঠে দায়িত্বের বোঝার চাপটাই তার ওপর বাড়তি কষ্ট বিবেচিত হয়। এ জন্য দায়িত্বের বোঝা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আসলে দায়িত্ব শব্দটির আভিধানিক অর্থের মধ্যে কষ্টের তাগিদ পাওয়া যায়। কারণ আরবরা যখন কাউকে কোনো কঠিন ও কষ্টকর কাজের হুকুম দেন তখন বলেন তার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দাও। এ দৃষ্টিতে বিচার করে এ ধরনের কাজকে কষ্টকর বলা হয়েছে।

চতুর্থ ব্যবহার : ইতিপূর্বের আলোচনায় যেসব কাজের জন্য কষ্ট অনিবার্য হয়েছে সেগুলোর তুলনায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ দায়িত্ব চাপানোর মধ্যে দায়িত্বশীলকে তার আত্মিক কামণা থেকে বের করে নিয়ে আসার বিষয়টিও অন্তরভুক্ত রয়েছে। আর সাধারণভাবে কামণার বিরোধিতা করা তার জন্য কষ্টকর হয়। কামণার জন্য মানুষ কষ্ট ও ক্লেশের সম্মুখীন হয়। এটা মানুষের একটি পরিচিত প্রাকৃতিক প্রবণতা।

মোটামুটি আরবী ভাষায় কষ্ট শব্দের এ চার ধরনের ব্যবহার দেখা যায়।

প্রথম ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরীয়ত কোনো প্রকার দায়িত্ব আরোপ করে নি।

দ্বিতীয় ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া নয়। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি পথ আছে :

এক. 'নস' সুস্পষ্ট ভাষায় এই উম্মতের উপর থেকে কঠিনতা, কষ্ট ও সংকীর্ণতা উঠিয়ে নেবার এবং সহজতা ও কোমলতা আরোপ করার বাণী উচ্চারণ করে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।'[৫১]

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা চান না।'[৫১] তিনি আরো বলেন, 'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ করেন নি।'[৫২] এ ধরনের আরো বিভিন্ন নস্ রয়েছে।

দুই. শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রুখসাত তথা ছাড় দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি শরীয়তের একটি নির্ধারিত বিষয় এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি দীনী জ্ঞান। যেমন সফরে ও অসুস্থতায় রমযানের রোযার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া, সফরে নামাযে কসরের ব্যবস্থা করা, সফরে 'জামা বাইনাস সালাতাইন' অর্থাৎ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার অনুমতি দেয়া এবং ক্ষুধায় প্রাণ সংশয়ের আশংকায় একান্ত বাধ্য হয়ে হারাম বস্তু খাওয়া। নিসন্দেহে এসব সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার কথা প্রমাণ করে।

তিন. দায়িত্বের ক্ষেত্রে এর অস্তিত্বশীল না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, শরীয়ত প্রণেতা এর নির্দেশ দেন নি। এরপরও যদি এটা ঘটে যায় তাহলে শরীয়তের মধ্যে বৈপরীত্য ও মতবিরোধ দেখা দেবে। আর শরীয়তে এই ধরনের বৈপরীত্য ও মতবিরোধ নেই। কারণ শরীয়ত প্রণীত হয়েছে কষ্ট ও কঠিনতাকে লক্ষ করেই এবং যখনই প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীয়তের লক্ষ কোমলতা ও সহজতা তখনই এ দুয়ের মাঝে বৈপরীত্য ও বিরোধ প্রবল হয়েছে। কিন্তু মূলত ইসলামী শরীয়ত এই ধরনের বিরোধ ও বৈপরীত্যমুক্ত।[৫৩]

এখন তৃতীয় ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা যে এমন পর্যায়ের কোনো দায়িত্ব নির্মাণ করেছেন যার মধ্যে কোনো না কোনো প্রকার কষ্ট ও কঠিনতা আছে, এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসের ক্ষেত্রে একে কষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয় না। যেমন জীবিকা অর্জনের জন্য শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে যে নিয়মিত কষ্ট ও মেহনত করা হয় তাকে কষ্ট বলে অভিহিত করা হয় না। কারণ অভ্যাসের ফলে তা সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ কষ্ট খতম হয়ে যায় না। বরং বুদ্ধিমান ও অভ্যস্ত জনেরা এর মাধ্যমে কুড়েমি দূর হবার কথা বলে থাকেন এবং তারা এক্ষেত্রে কুড়েমির জন্য ভর্ৎসনা করে থাকেন। কাজেই এভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা যায়। এই অর্থের প্রতি লক্ষ করলে নিছক কষ্ট এবং অভ্যাসের ফলে যাকে কষ্ট বলা হয় না এমন কষ্টের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৪]

এর নিয়ম হচ্ছে : কাজটি যদি এমন হয় যে, নিয়মিত চলতে চলতে একদিন বন্ধ হয়ে যায়, অথবা তার অংশ বিশেষ বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা মানসিক দ্বিধা, অর্থনৈতিক অবস্থা বা পরিস্থিতির কারণে ব্যাহত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কষ্টটি অভ্যস্ত হয়ে ওঠা কষ্টের পর্যায়ভুক্ত হবে না। আর যদি তার মধ্যে পারতপক্ষে এসবের কিছুই না থাকে তাহলে কষ্ট অভ্যাসের মধ্যে গণ্যই হবে না। যদি একে কষ্ট নাম দেয়া যায়, তাহলে এ দুনিয়ায় মানুষের খাওয়া, পরা, বসবাস করা এবং জীবন যাপনের সমস্ত অবস্থাই কষ্টই কষ্ট। কিন্তু মানুষকে এসব নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাকে এসব অবস্থার শিকারে পরিণত করা হয় নি। এভাবেই দায়িত্ব সক্রিয় ও বাস্তব রূপ নিয়েছে। কাজেই দায়িত্ব

এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট কষ্ট ও ক্লেশের অর্থ বুঝতে হবে।

এ বিষয়টি নির্ণীত হয়ে যাবার পর মানুষের প্রতি নির্ধারিত দায়িত্ব অভ্যস্ত কষ্টের অন্তরভুক্ত হবে না। কাজেই শরীয়ত প্রণেতার দাবীর উদ্দেশ্য কষ্ট নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দায়িত্বশীলের প্রতি আরোপিত কল্যাণ। মানুষের থেকে সংকীর্ণতা ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে তা এরই সাক্ষবহ।[৫৫]

চতুর্থ ধরনের কষ্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, মানুষের প্রবৃত্তি যা চায় তার বিরোধিতা করা এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা তার জন্য কঠিন ও কষ্টকর হয়। এ কারণে প্রবৃত্তির অনুসারীরা অবাধ্যতার চরমে পৌছে যায়। তাদের জন্য এই সাক্ষই যথেষ্ট : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব মুশরিক, আহলি কিতাব ও অন্য লোকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনি বহু বছর জীবন অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু তারা তাঁর নিষেধে কর্ণপাত করে নি। তারা বহু প্রাণ ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট করেছিল কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে রাজি হয় নি। মহান আল্লাহ এ প্রসংগে বলেন : 'তুমি কি তাকে লক্ষ করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন।[৫৬] 'তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।'[৫৭] আল্লাহ আরো বলেন : 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার কাছে তার মন্দ কাজগুলো শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ?" [৫৮]

এ ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াতে এ কথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

আমরা জানি শরীয়ত প্রণেতা শরীয়তের বিধান রচনা করে মানুষকে প্রবৃত্তির অনুগামিতা থেকে বের করে এনেছেন এবং তাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করেছেন যেমন সে বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর বান্দা আছে।

এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা যেমন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য কষ্ট নয়, যদিও অভ্যাসের দৃষ্টিতে তা কঠিন অনুভূত হয়, তবুও যদি তা বিবেচনাযোগ্য করে শরীয়তের বিধান হালকা ও সহজ করা হয়, তাহলে তা শরীয়ত প্রণয়নের উদ্দেশ্যই বাতিল করে দিতো। কাজেই এটা বাতিল হিসাবে গণ্য। আর যা বাতিলের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাও বাতিল।[৫৯]

এই আলোচনার পর আমরা একথা বলতে পারবো যে, মহান আল্লাহ আমাদের ওপর শরীয়তের এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নি যা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যা কিছু দায়িত্ব চাপিয়েছেন তার মধ্যে অবশ্যই কিছু চিরাচরিত কষ্ট আছেই। এই কষ্ট ঐ দায়িত্বের সাথে জড়িত, শরীয়ত প্রণেতার মৌল উদ্দেশ্য এই কষ্ট নয়। তবে এর মাধ্যমে দায়িত্বশীলের জন্য ইহকালীন বা পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্য রয়েছে।

তৃতীয় বিষয়

আহলি সুন্নাত ও মু'তাযিলাদের দৃষ্টিতে সৎগুণ ও অসৎগুণ কোন পর্যায়ভক্ত ? মু'তাযিলারাই এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে : সৎগুণ ও অসৎগুণ কি কর্মের গুণ বিশেষ যার ভিত্তিতে শরীয়ত প্রণেতা একটি করার হুকুম দিয়েছেন এবং অন্যটি নিষিদ্ধ করেছেন ? যদি সত্যের মধ্যে সৎগুণ না থাকতো তাহলে তা করার হুকুম দেয়া হতো না, আর যদি মিথ্যার মধ্যে অসৎগুণ না থাকতো তাহলে তা নিষিদ্ধ করা হতো না। অথবা শরীয়ত প্রণেতা তাঁর হুকুমের মাধ্যমে সত্যকে সৎগুণ সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মিথ্যাকে অসৎগুণ সম্পন্ন করেছেন ? তিনি চাইলে এর উলটোটি করতে পারতেন। রসূলদের আগমনের পূর্বে নিছক বুদ্ধিবৃত্তি কি বস্তুর মধ্যে সৎগুণ ও অসৎগুণ উপলব্ধি করতে পারতেনা ?

ঘটনাক্রমিক অবস্থান

উভয় পক্ষই ঐকমত্যে পৌছেছেন। অর্থাৎ মু'তাযিলা ও আহলি সুন্নাত এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে এই সংগায় তাঁরা এ ব্যাপারেও একমত হয়েছেন যে, সমগ্র কর্ম মূলত ওয়াজিব, মানদূব, মুবাহ, হারাম ও মাকরূহ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। আর সৎগুণ ও অসৎগুণ স্বভাবের উপযোগী বা বিরোধী এবং পূর্ণতা ও অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন জ্ঞানের সৌন্দর্য ও মূর্খতার কদর্যতা। এ প্রশ্নে উভয় দলের মধ্যে বিরোধ নেই। এই সঙ্গে তারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পশুদের কর্মের সাথে সৎগুণ ও অসৎগুণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।[৬০]

এরপর ব্যক্তির কাজের সৎ ও অসৎগুণকে তার ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রশ্নে এবং তার মধ্যে যে হুকুম আছে শরীয়ত বিধৃত হবার পূর্বে কর্মের জন্য সেই ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভিত্তিতে বুদ্ধির তা উপলব্ধি করার ব্যাপারে তারা বিরোধ করেছেন।

মু'তাযিলাদের অভিমত

অধিকাংশ মু'তাযিলার মতে, শরীয়তের আদেশ নিষেধ ছাড়াই কর্ম তার আপন সত্তায় সৎগুণ ও অসৎগুণে গুণান্বিত। তাদের মতে, বুদ্ধি একথা বলে যে, অসৎকাজ যে করে সে নিন্দাবাদের ভাগী হবে। অন্যদিকে সৎ কাজ করলে নিন্দাযোগ্য হবে না। তারপর তাদের মতে, অসৎ মানে হারাম। আর সৎ-এর মর্যাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেউ কোনো কাজ করার পর বুদ্ধি যদি বলে যে, সে প্রশংসার অধিকারী এবং কাজটি পরিহার করার পর যদি বলে সে নিন্দাবাদের যোগ্য, তাহলে বুঝতে হবে কাজটি না করা ওয়াজিব। অন্যথায় কাজটি করার পর যদি সে শুধুমাত্র প্রশংসার যোগ্য হয় এবং না করলে প্রশংসা ও নিন্দা কিছুরই যোগ্য হয় না, তাহলে কাজটি মানদূব। আর কাজটি পরিহার করলে যদি সে শুধুমাত্র প্রশংসার যোগ্য হয়, তাহলে কাজটি মাকরূহ অন্যদিকে কাজটি করলে বা না করলে যদি সে নিন্দাবাদ বা প্রশংসার কোনোটারই যোগ্য না হয়,

তাহলে কাজটি মাকরূহ। অন্যদিকে কাজটি করলে বা না করলে যদি সে নিন্দাবাদ বা প্রশংসার কোনোটারই যোগ্য না হয়, তাহলেকাজটি মুবাহ।

বুদ্ধির সম্ভাবনার বিষয়ে তারা বলেন : বুদ্ধি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং সমাজের অধিকাংশ জনের লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে কোনো কোনো কাজের সামগ্রিক বিধান দিতে সক্ষম হয়। কাজের প্রভাব সমাজের দিকে ধাবিত হয় এবং কর্মগুণের সাথে সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যেমন সৎগুণের সৌন্দর্য হিসাবে বলা যায় ন্যায় বিচার, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ডুবন্তকে উদ্ধার করা ও দরিদ্রকে সাহায্য করা ইত্যাদি।[৬১]

কোনো কোনো মু'তাযিলীর মতে, কর্মের সাথে যে কারণ সম্পৃক্ত থাকে তাই তাকে সৎগুণ ও অসৎগুণ সম্পন্ন করে। কারণ খুঁটিনাটি ও আংশিক বিষয়ের ভিত্তিতে পূর্ণাংগ পরীক্ষা নিরীক্ষা অসম্ভব।'

মু'তাযিলীদের মতে শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ হচ্ছে উন্মুক্তকারী, এগুলো নির্ধারিত নয়। কাজেই নামায ওয়াজিব হওয়া ও যিনা হারাম হওয়ার বিষয় দুটি তাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ গুণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত, আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে নয়। বরং নামায ও যিনা তাদের আদেশ নিষেধ প্রকাশ ও প্রমাণ করে। ফলে কর্মকে যখন তারা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তখন তার অসৎগুণের জন্য প্রাপ্য শাস্তিকে বিলম্বিত এবং নিন্দাবাদকে দ্রুতগামী করে।

কাযী আবদুল জাব্বার তাঁর 'মুগান্নী' গ্রন্থে বলেন : প্রত্যেকটি নির্দেশ বুদ্ধি অথবা তার উপার্জনের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করতে শেখায়। কাজেই শ্রবণের সাথে তার সম্পর্ক জোড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রবণ প্রমাণ সাপেক্ষে তার মধ্যেই ফিরে আসে। আর শ্রবণ অনুষ্ঠিত না হলেও যে বিষয়ে জানা নেই তার সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৬২] বুদ্ধির প্রয়োজন অনুযায়ী জানার মাধ্যমে কল্যাণকর হয়, যেমন ঈমানের সুন্দরতা ও কুফরীর কদর্যতা। আবার তার উপার্জন অনুযায়ী জানার মাধ্যমে কল্যাণকর হয়, যেমন ক্ষতিকারক সত্যবাদিতার সুন্দরতা এবং লাভজনক মিথ্যাবাদিতার কদর্যতা। আর শ্রবণ অনুষ্ঠিত না হলেও বুদ্ধি অথবা তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাজ করতে শেখানো হয় না তাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেমন ইবাদত।[৬২]

আশ'আরীদের মতে, উপরোল্লিখিত অর্থে কর্মে কোনো সুন্দরতা ও কদর্যতা নেই। বরং কর্মের নিষিদ্ধতাই তার কদর্যতা এবং তার বিপরীতটিই সুন্দরতা। তার নিজের মধ্যে এমন কোনো গুণ নেই যা শরীয়ত উন্মুক্ত করে দেবে। বরং কর্মগুণ দু'টি শরীয়তের দ্বারা গুণান্বিত। আর বিষয়টি যদি উলটে যায় তাহলে সুন্দর কদর্যে এবং কদর্য সুন্দরে পরিণত হবে। তাদের বক্তব্যের সার কথা হলো : শরীয়ত প্রণেতার আদেশ ও নিষেধ ছাড়া কর্মে সুন্দরতা ও কদর্যতা সৃষ্টি হয় না। তার আপন সত্তায় এ গুণাবলী নেই। বাইরের আরোপিত কোনো বিষয়ও তার মধ্যে এ গুণাবলী সৃষ্টি করে না। তারা বলেন : আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, মু'তাযিলারা সুন্দরতা ও কদর্যতাকে যে অর্থে

উপস্থাপন করেছে তা কর্মের মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হয় নি। বরং ব্যক্তি সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। কাজেই ব্যক্তিগত গুণের কোনো অর্থই নেই। শরীয়ত প্রণেতা তাঁর হুকুমের মাধ্যমে যাকে ভালো বলেছেন তাই ভালো এবং যাকে মন্দ বলেছেন তাই মন্দ। সেখানে বুদ্ধির কোনো দখল নেই।[৬৩]

যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে সুন্দরতা ও কদর্যতা

কালাম শাস্ত্রে এ আলোচনার শেকড় বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। সেখান থেকে তা উসূল শাস্ত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে। তার ভিত্তিতে উসূলবিদগণ দায়িত্বশীলদের কর্ম এবং তার মধ্যে আল্লাহর হুকুম জানার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি তাদের জন্য শরীয়তের কল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতবাদের সাথে সম্পর্ক জোড়ারও একটি পদ্ধতি। কর্মের পেছনে রয়েছে তা থেকে কল্যাণ লাভ ও ক্ষতি দূর করার কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ। এখন এই কল্যাণ ও ক্ষতি কি কেবল শরীয়তের মাধ্যমেই জানা যাবে অথবা বুদ্ধির মাধ্যমেও জানা সম্ভব? এটি একটি আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়।

শরীয়তের বিধানসমূহ যখন দায়িত্বশীলদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং কর্মছাড়া যখন কোনো দায়িত্ব সম্পাদিত হয় না তখন অবশ্যই আমাদের দায়িত্বশীলদের কর্ম ও তার শর্তাবলী আলোচনা করতে হবে।

আমরা বলবো, কর্ম ছাড়া কোনো দায়িত্বের অস্তিত্বই নেই। আদেশের ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট। তবে নিষেধের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে ব্যক্তিকে কাজটি থেকে বিরত রাখাই উদ্দেশ্য হয়। আর এটা সম্ভবই হয় না যতক্ষণ না কোনো আহ্বানকারী সেদিকে আহ্বান করে। কাজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন পূর্ণকারী কোনো দায়িত্ব বর্তায় না। শরীয়ত প্রণেতা যখন বলেন : যিনার ধারে কাছেও যেও না, তখন এর অর্থ হয়, তোমার প্রবৃত্তি যদি যিনার প্রত্যাশী হয় তাহলে তাকে তা থেকে বিরত রাখো। কারণ যখন মনের মধ্যে কল্পনাই জাগবেনা তখন তা থেকে বিরত থাকার কথা চিন্তা করবেন কেমন করে ? কাজেই এটি হচ্ছে ঝুলন্ত দায়িত্ব। ফকীহ্গণ দায়িত্বকে কর্মের সাথে বেঁধে দিয়েছেন। কারণ এটি বান্দার উপার্জন। কাজেই তার ক্ষমতার মধ্যেই এর সীমানা। আর বান্দার উপার্জন না হলে তার ক্ষমতার মধ্যে এটি পড়ে না। কারণ ক্ষমতার কোনো প্রভাব সেখানে পড়ছে না।[৬৫]

দায়িত্বের আওতাধীন কর্মের মধ্যে বিভিন্ন শর্ত থাকে।

প্রথম শর্ত : কর্ম সঠিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। একমাত্র অস্তিত্বহীন আদেশ ছাড়া এমন কোনো আদেশ নেই যার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় শর্ত : বান্দার তা উপার্জন করার বৈধতা ও ইখতিয়ার থাকতে হবে। যেমন যায়েদ চিঠি লিখতে ও পোশাক তৈরি করতে পারে। কিন্তু উমরের কাছে যায়েদের চিঠি লেখা এবং উমরের পোশাক তৈরি করা যায়েদের জন্য বৈধ করা হয় নি। ফলে কর্ম

সংঘটিত হবার সম্ভাবনার সাথে সাথে যে সম্পাদন করবে তার ক্ষমতার মধ্যেও তাকে আনতে হবে।

তৃতীয় শর্ত : যাকে আদেশ করা হয় তার জন্য কাজটি জ্ঞাত এবং অন্যান্য কাজ থেকে পৃথক হতে হবে, যাতে সে সেই কাজটি করার সংকল্প করতে পারে।

চতুর্থ শর্ত : কাজটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে, এ বিষয়টিও জ্ঞাত হতে হবে, যাতে আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যেসব আদেশের মধ্যে আনুগত্য ও নৈকট্যের অপরিহার্য বিধান আছে সেগুলোর সাথে এটি সংশ্লিষ্ট। এখানে জ্ঞাত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জ্ঞানের সম্ভাবনা, কাজেই একথা বলা যাবে না যে, কাফেরকে ঈমান আনার আদেশ করা হয়েছে কিন্তু সে একথা জানে না। কারণ দাওয়াত পৌছে যাওয়ার পর সেটি জানার পর্যায়ে পৌছে যায়। তখন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং কর্মের সম্ভাবনা অর্জিত হয়।

পঞ্চম শর্ত : কাজটি বাদ দেয়ার জন্য সঠিক সংকল্প হতে হবে এবং তা হবে আনুগত্যের ভিত্তিতে। আর অধিকাংশ অভ্যাসের সাথে এগুলো সংশ্লিষ্ট। তবে দু'টি জিনিস এর ব্যতিক্রম। এর একটি হচ্ছে : প্রথম ওয়াজিব অর্থাৎ ওয়াজিবের মধ্যে পরিচিত দৃষ্টি। এক্ষেত্রে আনুগত্যের ভিত্তিতে বাদ দেয়ার সংকল্প হওয়া সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ আনুগত্য ও আন্তরিকতার সংকল্পের আসলত্ব। এক্ষেত্রে যদি সংকল্পের অভাব অনুভব করা হয় তাহলে সংকল্প অভাব অনুভব করবে আর এক সংকল্পের এবং এভাবে এর অশেষ ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।[৬৬]

উসূলবিদগণ এই শর্তাবলীর প্রশ্নে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এটি অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

প্রমাণপঞ্জি

১. সূরা আশ্‌শূরা : ৫২ আয়াত।
২. সূরা আল কলম : ৪ আয়াত
৩. সূরা হুজুরাত : ৪ আয়াত।
৪. লিসানুল আরব : ৮/১৭৫-১৭৭ পৃষ্ঠা। আন নিহায়া লি ইবনে আছীর ফী গারীবিল হাদীস : ২/২৩১ পৃষ্ঠা, আল কামূসুল মুহীত : ৩/৪৪ পৃঃ। আল মিসবাহুল মুনীর : ৩৭৩ পৃঃ। আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন : ২৫৯ পৃষ্ঠা
৫. সূরা আল মায়েদাহ : ৪৮ আয়াত।
৬. সূরা আল জাছিয়া : ১৮ আয়াত।

৭. তাফসীর আত্‌তাবারী : ২৫/৮৮ পৃঃ, হাশিয়াতুল জামাল : ৩/১৩৬ পৃঃ, আল কুরতুবী ১৬/১৬৩ পৃষ্ঠা। ফখরুর রাযী : ৭/৩৩২ পৃষ্ঠা, আল আলুসী : ৬/২৩৫ পৃষ্ঠা।
৮. আন নিহায়া, ইবনুল আছীর, ২য় খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা।
৯. তারীখুত তাশরীইল ইসলামী, শায়খ আবদুর রহমান তাজ ও শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্‌সাইস, ৮-৯ পৃষ্ঠা। তাফসীর আল মানার, ৬ খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা। তারীখ আত্‌তাশরী' আল ইসলামী, উস্তায আশ্‌শিহাবী, ৬ পৃষ্ঠা।
১০. সূরা আশ্‌শূরা, ১৩ আয়াত।
১১. তাফসীর আবিস সাউদ বাহামিশ আল ফাখরুর রাযী, ৩য় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।
১২. আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, ২৫৯ পৃষ্ঠা।
১৩. সূরা আহযাব, ৩৩ আয়াত।
১৪. তারীখ আত্‌তাশরী' আল ইসলামী, শায়খ আবদুর রহমান তাজ ও শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্‌সাইস, ৮-৯ পৃষ্ঠা। তারীখ আত্‌তাশ্‌রী', আল উস্তায আশশিহাবী, ৬ পৃষ্ঠা।
১৫. সূরা আশ্ শূরা, ১৩ আয়াত।
১৫(ক) সূরা আল আনআম, ৯০ আয়াত।
১৬. সূরা আল মায়েদা, ৪৮ আয়াত।
১৬(ক) সূরা আল জাসিয়া, ১৮ আয়াত।
১৭. আল কুরতুবী, ১৬ খণ্ড, ১০-১১ পৃষ্ঠা।
১৮. আল কুরতুবী, ১৫ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা এবং হাশিয়াতুল জামাল আলাল জালালাইন, ৪ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।
১৯. কুরতুবী, ১৬ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা এবং হাশিয়াতুল জামাল, ৪ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।
২০. তাফসীর আল ফখরুর রাযী, ৭ খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা।
২১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা
২২. মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ইবনে আইয়ুব সা'দ আয্‌যাওজী আদ্ দামেশ্‌কী। পরিচিতি লাভ করেছেন ইবনে কাইয়েম জাওযী বা ইবনে কাইয়েম নামে। দামেশ্‌কে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৭৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
২৩. মিফতাহু দারুস সাআদাহ, ইবনে কাইয়েম, ২ খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা।
২৪. জাম্‌উল জাওয়ামে' গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যা ও ফুটনোট, ১ খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা। তানকীহুল ফুসূল, কাররাফী, ৩১ পৃষ্ঠা। আল মিরআতু ফিলউসূল, ২ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা। আল আসনবী আলা মানহাজিল বাইদাবী, ১ খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।
২৫. তানকীহুল ফুসূল, কাররাফী, ৩৩ পৃষ্ঠা এবং উসূল মুহাম্মদ আল খিদরী, ৫৯ পৃষ্ঠা।
২৬. তাঁর মূল নাম হচ্ছে, শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল 'উলা ইদরীস ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আস্‌সান্‌হাজী আল বাহনাসী

আল মিসরী আল কররাফী, মৃত্যু : ৬৮৪ হিজরী। তিনি ছিলেন মালেকী মযহাবের অনুসারী। শায়খ ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম ছিলেন তাঁর শিক্ষক। কার্‌রাফীর 'আল আহকাম ফী তামীযিল ফাতওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসারুরুফাতুল কাযী ওয়াল ইমাম' গ্রন্থে মাহমুদ উনূসের লিখিত ভূমিকা দেখুন।

২৭. তানকীহুল ফুসূল, ৩৩ পৃষ্ঠা।
২৮. উসূলুল খিদরী, ৫৯ পৃষ্ঠা।
২৯. উসূলুল খিদরী, ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা।
৩০. আল আহকাম, আল আমাদী, ১ খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা। রওদাতুন নাযের, ৩০ পৃষ্ঠা। মুস্‌তাস্‌ফা, ১ খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা। ইবনুল হাজেব আলাল আদাদ, ২য় খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।
৩১. আল আহকাম, আল আমাদী, ১ খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা। রওদাতুন নাযের, ৩০ পৃষ্ঠা। এবং আল মুশ্‌তাসফা, ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।
৩২. শিফাউল গালীল, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।
৩৩. শিফাউল গালীল, ৩৫৯ পৃষ্ঠা। মুস্‌তাশ্‌ফা, ১ম খণ্ড ৯৩ পৃষ্ঠা এবং রওদাতুন নাযের, ৩০ পৃষ্ঠা।
৩৪. তানকীহুল ফুসূল, কাররাফী, ৩৯ পৃষ্ঠা।
৩৫. তানকীহুল ফুসূল ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা।
৩৬. রাজেউল আমাদী, ১ খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। আল মুস্তাশ্‌ফা, ১ খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, জাম্‌উল জাওয়ামে', ১ খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। তানকীহুল ফুসূল, ৩৬ পৃষ্ঠা। উসূল মুহাম্মাদুল খিদরী, ৮০ পৃষ্ঠা।
৩৭. রাজেউল মুস্‌তাশ্‌ফা, ১ খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। আল আমাদী, ১ খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। তানকীহুল ফুসূল ৩৬ পৃষ্ঠা। জামউল জাওয়ামে,' ১ খণ্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। আল আসনাবী, ১ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।
৩৮. আল আযীমাত শারহুল আদাদ আলা ইবনিল হাজেব, ২ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা, মুস্‌তাশ্‌ফা, ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। আল আমাদী, ২ খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।
৩৯. আল মুস্‌তাশ্‌ফা, ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা
৪০. উসূল মুহাম্মদুল খিদরী, ৭১-৭২ পৃষ্ঠা।
৪১. আল মুসতাশ্‌ফা, ১ খণ্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। আল আমাদী, ১ খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা। রওদাতুন নাযের, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা। তানকীহুল ফুসূল, ৪১ পৃষ্ঠা। শারহুল আদাদ আলা ইবনিল হাজেব, ২ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।
৪১. সূরা আল বাকারা, ১৩২ আয়াত
৪৩. শাতবী তাঁর আল মাওয়াফিকাত গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।
৪৪. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা।

৪৫. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা।

৪৬. শাত্বী তাঁর মাওয়াফিকাত গ্রন্থে এবং বুখারী ও তিরমিযীর হাদীসে বলা হয়েছে– (প্রতিবেশীর গৃহে)– হাদীয়া পাঠাও। কারণ হাদীয়া মনের ময়লা দূর করে। কোনো প্রতিবেশীকে তাচ্ছিল্য করো না, ছাগলের পায়ের একটা হাড্ডি হলেও তার কাছে পাঠাও।

৪৭. ঐ

৪৮. সূরা আন নহল, ৭ আয়াত।

৪৯. আল মাওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৯ (ক)বুখারী, রিকাক অধ্যায়

৫০. সূরাআল বাকারাহ : ২৮৬ আয়াত

৫১. আল বাকারাহ ১৮৫ আয়াত।

৫২. আল হাজ্জ : ৭৮ আয়াত।

৫৩. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা।

৫৪. ঐ

৫৫. ঐ

৫৬. সূরা আল জাছিয়া, ২৩ আয়াত।

৫৭. সূরা আন নজম, ২৩ আয়াত।

৫৮. সূরা মুহাম্মদ, ১৪ আয়াত।

৫৯. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৭৬-১০৯ পৃষ্ঠা এবং আল মিরআতু বিহাশিয়াতিল আযমিরী, ১ খণ্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

৬০. আল আমাদী, ১ খণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, জাম্উল জাওয়ামে' শারবিনীর হাশিয়াসহ, ১ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা এবং উসূলুল খিদরী, ২১ পৃষ্ঠা।

৬১. উসূলুল খিদরী, ২১-৪২ পৃষ্ঠা।

৬২. আল মুগান্না, ১৭ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা এবং শারহে উসূলিল খামসা, ৭১ পৃষ্ঠা।

৬৩. আল মুনতাহা, ইবনে হাজেব, ২১ পৃষ্ঠা।

৬৪. জামউল জাওয়ামে' শারবিনীর হাশিয়াসহ, ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা, উসূলুল খিদরী, ২৩ পৃষ্ঠা এবং আলমিরআতু আযমিরীর হাশিয়াসহ, ১ খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা।

৬৫. উসূলুল খিদরী, ৯১-৯২ পৃষ্ঠা।

৬৬. আল মাওয়াফিকাত, ২ খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা এবং উসূলুল খিদরী, ৮২ পৃষ্ঠা।

ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের গুরুত্ব

আল্লামা ইবনে কাইয়েম

[এ নিবন্ধটি আল্লামা ইবনে কাইয়েম (র.) এর বিখ্যাত কিতাব "ই'লামুল মু'কিঈন"-এর একটি অধ্যায়। এতে তিনি স্থান, কাল পাত্র ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দীনী কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে শরীয়তের ফয়সালাতে শর্তাধীন পরিবর্তন ঘটে থাকে এই মূলনীতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিষয়টির উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন এর সিদ্ধান্ত ও মতামত সবিস্তারে উল্লেখ পূর্বক বিশ্লেষণ করেছেন। অতি বিস্তৃত হওয়ার আশংকায় এখানে আমরা শিরোনামের মৌলিক দিক গুলো চয়ন করেছি। তবে সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয় ও ধারা উপধারাগুলো এড়িয়ে যাই নি।] – অনুবাদক

স্থান কাল পাত্র ও পরিস্থিতির ভিন্নতা এবং নিয়ত সমাজ ও পরিবেশের পরিবর্তনে ফাতওয়া তথা ফয়সালায় পরিবর্তন ঘটে। ফয়সালা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি একটি মূলনীতি। যারা এই মূলনীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম তারা শরয়ী ফয়সালার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভ্রান্তির শিকার হন। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে অত্যাধিক সংকীর্ণতা, বেশি কষ্টকর, অসহনীয় ইত্যাকার কিছু মূলনীতিকে আইনসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো ইসলামী শরীয়ত সর্বতোভাবে মানুষের মঙ্গলামঙ্গলকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়ত মানুষের অহেতুক কোন কষ্টকে বৈধতা দেয় নি। কারণ ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তিই হলো মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ। বস্তুত ইসলামী শরীয়ত ন্যায়, সমতা, দয়া, সহমর্মিতা, যুক্তি ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক। এ কারণে যেসব বিষয় ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়, ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম, উদারতার বিপরীতে কঠোরতা, সহজের পরিবর্তে জটিল, কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ, যুক্তির পরিবর্তে অযৌক্তিক এবং সহজ হওয়ার পরিবর্তে কঠিন বলে বিবেচিত হয় তা কখনও শরীয়তের আইন হতে পারে না। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যুক্তি দিয়ে তাকে যতোই সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হোক। বস্তুত মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ইনসাফ মানুষের প্রতি আল্লাহর দেয়া দয়া মায়া মমতা এবং জগতে আল্লাহর অনুগ্রহের ছায়া বিস্তৃত করার নামই হলো ইসলামী শরীয়ত। আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা, তাঁর কর্মকৌশল ও সর্বক্ষেত্রে সর্ব কর্মে তাঁর অস্তিত্বের প্রতিফলন ও প্রমাণ নির্ণয় করা এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের সততা প্রমাণ করার বিধানই হলো ইসলামী শরীয়ত।

লেখক : আল্লামা ইবনে কাইয়েম সপ্তম হিজরীর শেষার্ধে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রধানতম শাগরিদ, অনেকগুলো যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রণেতা। অষ্টম হিজরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি পরিচিত।

ইসলামী শরীয়ত এমন একটি আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর যা থেকে জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা পথের দিশা পেয়েছেন। ইসলামী শরীয়ত এমন একটি প্রদীপ সত্য সন্ধানী লোকজন যার দ্বারা গন্তব্য খোঁজে পেয়েছেন। ইসলামী শরীয়ত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা যদ্বারা সকল ব্যথিত যন্ত্রণাক্লিষ্ট পীড়া থেকে নিরাময় পেয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত এমন এক রাজপথ যে পথের যাত্রী নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌছে যায়। ইসলামী শরীয়ত দৃষ্টি নন্দিত, হৃদয়ের সঞ্জীবনী ও অন্তরের প্রশান্তি। জীবন জীবিকা সম্মান ইজ্জত মানসম্ভ্রম শান্তি নিরাপত্তা আহার ওষুধ রোগের প্রতিকার ব্যবস্থাও ইসলামী শরীয়তের অবদান। জগতের সকল সৌন্দর্য ও কল্যাণ ইসলামী শরীয়াত থেকেই উৎসারিত ও প্লাবিত। জগতের সকল মন্দ ও খারাপ জিনিস ইসলামী শরীয়তের ক্ষয়ক্ষতির নির্দশন।

ইসলামী শরীয়তের এসব নিদর্শন ও আদর্শ যদি জগতে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত না হতো তাহলে জগৎ আজ অসভ্যতার অন্ধকারে তলিয়ে যেতো।

ইসলামী শরীয়তের নিদর্শন যদি অবশিষ্ট না থাকতো তাহলে জগতের সভ্যতা বিগড়ে যেতো এবং জগতের সব কিছু ওলটপালট হয়ে যেতো। ইসলামী শরীয়ত যেহেতু মানবতার রক্ষা ও সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্যে প্রণীত তাই এই শরীয়তের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা আসমান যমীনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা যখন পাপ পঙ্কিলময় পৃথিবীর মানুষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করবেন তখন দুনিয়া থেকে ইসলামী শরীয়তের সকল নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। বস্তুত নবী করীম স. যে শরীয়ত নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা সকল সৃষ্টি জগতের জন্যে কল্যাণের ভিত্তি এবং জীবন জীবিকা ও সৌভাগ্যের চাবিকাটি।

এখন আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে ইসলামী শরীয়তের হুকুম ও ফয়সালা পরিবর্তনকারী মূলনীতি বাস্তব ও বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ এবং উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

অপরাধ দমনে পরিস্থিতির গুরুত্ব

অপরাধ দমনকে রসূল স. মুসলিম উম্মাহর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে অভিহিত করেছেন। যাতে অপরাধ দমন করে সমাজে সৎ ও সততা বলিষ্ঠ হয়, এবং কল্যাণের বার্তাবহ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। যে সমাজ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল পছন্দ করেন। কিন্তু কোন অপরাধ যদি এমন হয় যে অপরাধ দমন করতে গেলে কৃত অপরাধের চেয়েও আরো বেশী ভয়ানক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই অপরাধ দমনের চেষ্টা না করাই ভালো। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতির কারণে এ ধরণের অপরাধের বিরুদ্ধে দমন কার্যক্রম পরিচালনা না করলেও অপরাধ অপরাধই থেকে যায়। আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই অপরাধ ঘৃণ্য কাজ এবং অপরাধী

আল্লাহর গযব ও শাস্তির পাত্র। যেমন– শাসক ও ক্ষমতাসীনদের মধ্যে অন্যায় ও অপরাধ দেখেই তাদের বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা করা ঠিক হবে না। কেন না সরকারদ্রোহিতা মারাত্মক গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। এমনটি যদি জগতে রীতি হয়ে ওঠে তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে গোলযোগ বিশৃঙ্খলা থামবে না। সাহাবায়ে কেরাম রসূল স. এর কাছে অন্যায় অপরাধে জড়িত শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলেন। যেমন, কোন শাসক বা বড় ধরনের কর্মকর্তা যথারীতি নামাযের প্রতি যত্নবান ছিলেন না, নামাযের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মারাত্মক ধরনের গাফিলতি দেখা দিয়েছিল। রসূল স. সাহাবায়ে কেরামকে ক্ষমতাধর এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখলেন। এ প্রেক্ষিতে রসূল স. ইরশাদ করেন, 'না, তোমরা নামাযে গাফিলতি করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের দমন মূলক ব্যবস্থা নিবে না যতোক্ষণ তারা সকল ওয়াক্তের নামায আদায় করে।

রসূল স. আরো ইরশাদ করেন, কেউ যদি শাসকের মধ্যে কোন অন্যায় অপরাধ দেখো তাহলে ধৈর্যধারণ করবে এবং তার অনুগ্রহ প্রত্যাহার করবে না।

ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত বড় ধরনের গোলযোগ এবং মুসলমানদের পারস্পরিক বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষগুলোর পূর্বাপর ঘটনা যদি কেউ নিরাবেগ মেজাজে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন, উল্লেখিত মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে এবং অন্যায় অপরাধের ক্ষেত্রে অধৈর্য, অসহিষ্ণুতার ফলেই সমূহ বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল সংঘটিত হয়েছে। যারা শাসক ও ক্ষমতাসীনদের অন্যায় অপরাধে অধৈর্য হয়ে সেগুলো নির্মূল করতে সংঘর্ষের পথ অবলম্বন করেছিলেন, দেখা গেছে তাতে অন্যায় অপরাধ অবদমিত না হয়ে আরো দুর্দমনীয় রূপ ধারণ করেছে। আগের অন্যায়কে ছাপিয়ে গেছে দমননীতি প্রয়োগের পরবর্তী অপরাধ।

হিজরতের আগে মক্কায় নবী করীম স. এর চোখের সামনে মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতো কিন্তু তখন এগুলো দমনের মতো শক্তি নবীজীর স. ছিল না। চোখের সামনে অন্যায় অপরাধ সংঘটিত হতে দেখেও নবীজী নীরব ভূমিকা পালন করতেন। আল্লাহর কুদরতে যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে গেলো, নবীজীর কর্তৃত্বে নীত হলো মক্কা নগরী, কাফের শাসিত মক্কা মুসলমানদের শাসনাধীন চলে এলো তখন কা'বা গৃহ সংস্কার করে নবীজী ইব্রাহীম আ. এর মূল কাঠামোয় ফিরিয়ে আনার সংকল্প করলেন। কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নবী স. পরবর্তীতে ব্যাপক সংস্কার পরিকল্পনা মূলতবি করে দিলেন এই কারণে যে, সদ্য ইসলামে দীক্ষা নেয়া মক্কার মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের কা'বার অবকাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন বিরূপতা সৃষ্টি করতে পারে। ফলে ইব্রাহীমী কাঠামো বিনষ্ট হওয়ার কারণে কা'বা শরীফের বর্তমান ত্রুটির চেয়েও আরো বেশি ত্রুটি বিচ্যুতি জন্ম নেবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই নবীজী অন্যায় ও অপরাধে জড়িত শাসক, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি। কেন না শাসক ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ

থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ কিংবা দমনাভিযান চালালে সংঘটিত অন্যায় অপরাধের চেয়ে আরো জঘন্য অন্যায় অপরাধ জন্ম নেয়ার আশংকা ছিল।

অপরাধ দমনকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. অন্যায় অপরাধ নির্মূল করে সে ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।
২. অন্যায় অপরাধ সম্পূর্ণ নির্মূল সম্ভাব না হলেও অপরাধের ব্যাপকতা হ্রাস করা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।
৩. একটি অপরাধ নির্মূল করতে গিয়ে আরেকটি অপরাধের জন্ম দেয়া।
৪. একটি অপরাধ দমন করার কারণে এর চেয়েও আরো মারাত্মক অপরাধের আবির্ভাব ঘটা।

উল্লেখিত চার শ্রেণীর দমন কার্যক্রমের প্রথম দু'টি পর্যায়ের দমন কার্যক্রম পরিচালনা করা শরীয়তের দাবি। তৃতীয় পর্যায়ের দমন ব্যবস্থাটি বিবেচনা সাপেক্ষ। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনার পর যদি বিষয়টি আমলযোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে দমন তৎপরতা চালানো যাবে। কিন্তু চতুর্থ পর্যায়ের অপরাধ দমন তৎপরতা কিছুতেই চালানো যাবে না।

যেমন বিভ্রান্ত অপরাধ প্রবণ কতিপয় লোককে যদি কেউ জুয়া খেলায় লিপ্ত থাকতে দেখে, আর তাদেরকে জুয়ার আড্ডা থেকে তুলে এনে শরীয়ত সম্মত খেলাধুলা যেমন তরবারি চালনা, ঘোড়া চালনা, কিংবা শারীরিক ব্যায়াম, কারাতে ইত্যাদির মতো খেলায় লিপ্ত করতে পারে তাহলে খুবই ভালো, নয়তো অপরাধ প্রবণ এই লোকগুলোকে তাদের অপরাধ কর্মে বাধা দেয়া হবে আইন ও বুদ্ধি বিবেচনার দৃষ্টিতে চিন্তার দীনতার প্রতিফলন। অনুরূপ কেউ যদি কোথায়ও কিছু লোককে অবৈধ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকতে দেখে অথবা অশ্লীল নৃত্য সঙ্গীতের আড্ডা জমাতে দেখে এবং এদেরকে যদি কেউ অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে এনে বৈধ ও ভালো কাজে লিপ্ত করতে পারে তবে সেটি হবে নিসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু তাদের কাজে বাধা দিয়ে কেউ যদি তাদেরকে ভালো কাজে লিপ্ত করতে না পারে তবে তাদের কাজে বাধা না দেয়াই হবে উত্তম। কেন না বাধা দেয়া হবে তাদেরকে আগের চেয়ে মারাত্মক অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়া। কারণ একটি লঘু অপরাধে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের দ্বারা আরো মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অবকাশ ছিল না। সেই অপরাধ কর্মে বাধা দিয়ে তাদেরকে ভালো কাজে লিপ্ত করতে না পারাটা হবে আরো জঘন্যতম অপরাধের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

ধরুন কেউ পর্ণো সাহিত্য পাঠে মগ্ন। এ কাজে তাকে বাধা দিলে তার হয়তো বিদআত, ভ্রষ্টামী, যাদু টোনা, পীর ফকিরী ইত্যাকার ঈমানহানিকর বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে, এমতাবস্থায় তাকে পর্ণো সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকতে দেয়াটাই হবে সমীচীন। এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, বাগদাদে তাতারী আক্রমণের সময় আমরা কয়েকজন একটি গ্রামে গেলাম। সেখানকার কিছু লোককে কাবাব ও মদ্যপানে লিপ্ত দেখে আমাদের এক সাথী তাদেরকে একাজে নিষেধ করতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আরে দোস্ত! পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা কর। মদ ও কাবাব অপরাধ প্রবণ এই লোকগুলোকে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ এবং নারী শিশুদের উপরে অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বিরত রেখেছে। কাজেই এদেরকে এমতাবস্থায় থাকতে দেয়াই উচিত।

হাত কাটা দণ্ড প্রয়োগ প্রসংগ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চুরির অপরাধে 'হস্ত কর্তন দণ্ড' প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন- (আবু দাউদ)। এ প্রেক্ষিতে লক্ষনীয় বিষয় হলো, চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের দণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার ব্যবস্থা। যাকে বলা হয় 'হদ'। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দণ্ডিত অপরাধীদের তাদের অপরাধ প্রবণতা ও শত্রুতার কারণে আবেগ তাড়িত হয়ে দীনের কথা ভুলে গিয়ে কাফের বেঈমানদের পক্ষাবলম্বন করার আশঙ্কা থাকে। একজন গোনাহগার (অপরাধী) মুসলমানেরও মুসলিম এবং কাফেরের মধ্যে বিবদমান সাংঘর্ষিক অবস্থায় কাফেরদের পক্ষাবলম্বন করা আল্লাহর কাছে চুরির অপরাধে হাতকাটার দণ্ড মূলতবি হয়ে যাওয়া কিংবা বিলম্বিত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি জঘন্য। এ জন্যই রসূল আকরাম স. যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চুরির অপরাধে কোন সৈনিকের হাত কাটার দণ্ড মূলতবী রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বলে হযরত ওমর আবুদদারদা ও হযরত হুযাইফা রা. বর্ণনা করেছেন।

এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াই, ইমাম আওযাঈ ও অন্যরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত্রুদেশে কোন সৈনিকের অপরাধে 'হদ' বাস্তবায়ন করা যাবে না।

আল্লামা আবুল কাসেম খরকী র. তার প্রণীত গ্রন্থ 'মুখতাসার' এ এই মূলনীতির উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তার বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় এরূপ : শত্রু ভুখণ্ডে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন মুসলিমের অপরাধে 'হদ' বাস্তবায়ন করা যাবে না।

একবার এক যুদ্ধে বাশার বিন আরতাতের ঢাল কোন সৈনিক চুরি করে নিয়ে গেল। চোরকে গ্রেফতার করে বাশারের মুখোমুখি দাঁড় করালে বাশার বলল, 'আমি যদি রসূল স. এর কাছ থেকে এ কথা না শুনতাম যে, যুদ্ধ চলাকালে তোমরা চুরির অপরাধে কারো হাত কেটোনা, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার হাত কেটে ফেলতাম। (আবু দাউদ)

আবু মুহাম্মদ আল মুকাদ্দাসী বলেন, 'যুদ্ধ চলাকালে কারো উপর হদ দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করা যাবে না'– এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। সাঈদ ইবনে মানসুর তার প্রণীত গ্রন্থে আহওয়াস বিন হাকেম সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রা. আহওয়াসের নামে লিখিত ফরমানে নির্দেশ দেন– 'যুদ্ধ চলাকালে কোন সেনাপতি.

কোন ইউনিট প্রধান, কোন সিপাহী অথবা কোন মুসলমানের উপর 'হদ' দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করা যাবে না, যতক্ষণ না সেনাবাহিনী নিজ দেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে। কারণ তাতে এমনটি হওয়ার আশংকা রয়েছে যে, শয়তান অপরাধীকে ফুসলিয়ে কাফেরদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার প্ররোচনা দিতে পারে।

হযরত আবুদ্ দারদা রা. থেকেই অনুরূপ তথ্য বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলকামা বলেন– রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটি সেনাদলের সাথে আমি ছিলাম। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আমাদের সাথে ছিলেন আর ওয়ালিদ বিন উতবা ছিলেন আমাদের কমান্ডার। আমাদের কমান্ডার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মদপান করে বসল। আমরা তা জানতে পেরে সেখানেই 'হদ' প্রয়োগের জন্যে তৈরি হয়ে গেলাম। কিন্তু হুযাইফা আমাদের নিবৃত্ত করে বললেন, এমন একটি নাজুক সময়ে তোমরা হদ প্রয়োগ করতে চাচ্ছো যখন তোমাদের শত্রু তোমাদের সামনেই দাঁড়ান। তোমাদের এই কাজে শত্রুদের মনোবল চাঙ্গা হবে।'

কাদেসিয়া যুদ্ধে হযরত সাদ' বিন আবি ওয়াক্কাস রা. এর কাছে মদ পান করার অপরাধে আবু মিহজানকে গ্রেফতার করে আনা হলে সাদ তাকে বন্দী করে রাখলেন। বন্দী থাকা অবস্থায় আবু মিহজান দেখতে পেলেন মুসলিম বাহিনী কাফেরদের কাছে শোচনীয়ভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে এবং রণাঙ্গনে বেঈমানদের প্রধান্য বিরাজ করছে। এ অবস্থা দেখে আবু মিহজান স্বগতোক্তি করলেন, "হায় আফসোস! শত্রুদের বল্লমগুলো আমাদের ঘোড়াগুলোকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে আর আমি শিকলে বাঁধা অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছি"। এক পর্যায়ে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অব্যাহত ব্যর্থতা দেখে আবু মিহজান সেনাপতি হযরত সাদ এর স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন তার বাঁধন খুলে দিতে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন– দয়া করে আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন। আমি যুদ্ধে শরীক হবো। যদি বেঁচে থাকি তাহলে ফিরে এসে আবার শিকলে নিজেকে আটকে ফেলব, আর যদি মরে যাই তাহলে তো শাস্তির ব্যাপারই সমাধা হয়ে যাবে।'

হযরত সাদ এর স্ত্রী আবু মিহজানের বন্ধন খুলে দিলে আবু মিহজান সেনাপতি সাদ এর ঘোড়া নিয়েই রণাঙ্গনে চলে গেলেন (সেদিন আঘাতের কারণে সাদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি তাই তার ঘোড়া তাবুতে বাঁধা ছিল।) এবং বীর বিক্রমে শত্রুদের উপর হামলে পড়লেন। আবু মিহজান সেদিন এতোটাই বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন যে, তিনি যেদিকে ধাবিত হতেন শত্রু সারি মিসমার হয়ে যেতো। আকস্মিক এক যোদ্ধার এমন বীরত্ব দেখে মুসলিম সেনারা বলতে লাগলেন 'হয়তো কোন ফেরেশতা নাযিল হয়েছে।'

সেনাপতি হযরত সা'দ নিজেও আযীব নামক স্থানে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং অচেনা এ যোদ্ধার বীরত্বে প্রীত হচ্ছিলেন। অবশেষে আবু মিহজান একাকীই শত্রু সেনাদের তাড়িয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি মতো স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করলেন। আবু মিহজানের বীরত্ব ও তাকে মুক্ত করে দেয়ার ঘটনা হযরত সাদের কাছে তার স্ত্রী ব্যক্ত করলে সাদ বললেন, 'আল্লাহর কসম, রণাঙ্গনে অসাধারণ বীরত্বের জন্যে আমি তাকে শাস্তি দেবো না।'

আবু মিহজান পরিবর্তিত ফয়সালা শুনে বললেন, 'মদ্যপানের অপরাধে আমাকে চাবুক মেরে যখন পবিত্র করার চেষ্টা করা হতো তা আমাকে শরাব থেকে বিরত রাখতে পারতো না। আজ যেহেতু আপনি আমার শাস্তি মওকুফ করে দিলেন তাই আমি আল্লাহর কসম করে বলছি; আর কোন দিন এই অভিশাপ মুখে দেবো না।'

এ ঘটনার কোন একটি শব্দও দলীল, প্রমাণ, যুক্তি ও শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। সর্ব সম্মত ইজমা পরিপন্থী কোন কথাও এখানে নেই। বরং যদি বলা হয় হযরত সা'দ এর এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছে ইজমা তাহলে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

শাইখ ইবনে কুদামা তার প্রণীত কিতাব আলমুগনীতে লিখেছেন– সা'দ এর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সবাই একমত। এ ব্যাপারে কারো কোন মতভিন্নতা নেই।":

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ইমাম ইবনে কাইয়েম 'হদ' বিলম্বিত সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় লিখেছেন– "আমার দৃষ্টিতে এসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, হদ প্রয়োগ বিলম্বিতকরণে দু'টি উপকারের অন্তত একটি বিদ্যমান থাকলে তা আমলে আনা যেতে পারে।

১. যুদ্ধের কারণে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সৈন্যের উপস্থিতি মুসলিম বাহিনীতে প্রয়োজনীয়।
২. অথবা বিগড়ে যাওয়া এক অপরাধী সেনার বেঈমান তথা প্রতিপক্ষের সাথে মিশে যাওয়ার আশংকা।

উপর্যুক্ত কারণে 'হদ' প্রয়োগ বিলম্বিত করণের বিষয়টি শরীয়তের মূল নীতিতেই বিবৃত হয়েছে। যেমন– গর্ভবতী ও সদ্য প্রসবকারিনী নারীর হদ বাস্তবায়নের বিষয়টি বিলম্বিত করার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কুরআনুল কারীমে। অনুরূপভাবে কোন অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ থাকাবস্থায় হদ দণ্ডাদেশ বাস্তবায়নে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অতিশয় গরম ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও হদ বাস্তবায়ন করা জায়েয নয়। বস্তুত একজন অপরাধীর সুবিধা অসুবিধার ভিত্তিতে যদি হদ বাস্তবায়ন বিলম্বিত করা যায় তাহলে দীনের কল্যাণে হদ বিলম্বিত করা নিসন্দেহে প্রশংসনীয় ও জায়েয বিবেচিত হওয়া উচিত।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস আবু মিহজানের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাতে কারো মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, সাদ তো আবু মিহজানের হদ বিলম্বিত করেন নি একেবারে মওকুফ করে দিয়েছিলেন। দীনি কল্যাণে হদ রহিত করা কি জায়েয ?

এর জবাবে ইবনে কাইয়েম বলেন–

১. সা'দ এর এই সিদ্ধান্ত হদ রহিত করণের দলীল নয় যে এটিকে একেবারে হদ রহিত করণের মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হবে।
২. যারা সা'দ-এর এ কথা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারাও এর দ্বারা এই দাবী করেন পরাধীন দেশে তথা যুদ্ধক্ষেত্রে হদ বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক নয়।

ইমাম আবু হানিফা র. ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দৃশ্যত বুঝা যায় হযরত সাদ আবু মিহজানের হদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন। সাদ যখন আবু মিহজানের মধ্যে দীনের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণ মানসিকতা বীরত্ব ও তীব্র আবেগের বহিপ্রকাশ দেখতে পান তখন তিনি তার হদ তথা শাস্তি মওকুফ করে দেন। কারণ আবু মিহজানের সুকৃতি তার দুস্কৃতি ছাপিয়ে গেছে। যাকে বলা যেতে পারে এক টুকরো নাপাক জিনিস বিশাল জলাধারে লীন হয়ে গেছে। তা ছাড়াও সা'দ নিজে রণাঙ্গণে আবু মিহজানের মনোদৈহিক অকৃত্রিম তওবার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন মানুষ অকৃত্রিমতা ছাড়া রণাঙ্গণে এভাবে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে না। কারণ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন মানুষ গোনাহর পুনরাবৃত্তি করার মানসিকতা ধারণ করতে পারে না। জীবন মৃত্যুর কঠিন অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করে ফিরে এসে আবার স্বেচ্ছায় হাতে পায়ে শিকল পরে বন্দীত্ব বরণ করে নেয়ার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, আবু মিহজান সত্যিকার তওবা করেছে, তার অপরাধও শাস্তি ক্ষমাযোগ্য।

ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে নবীজীর দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত

উপরের বিস্তারিত আলোচনার পর ইমাম ইবনে কাইয়েম রসূল স. কর্তৃক শাস্তি মওকুফের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। সে সব ঘটনা শাস্তি মওকুফের প্রমাণ বহন করে।

১. এক ব্যক্তি নবী করীম স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অপরাধী আমাকে শাস্তি দিন।' তিনি বললেন, তুমি না এই মাত্র আমাদের সাথে নামায পড়লে ? লোকটি বললো, জী হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে নামায পড়েছি বটে। নবীজী তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'যাও! তোমার অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

   এ ক্ষেত্রে সেই শাস্তি মওকুফের ব্যাপারটি প্রতিফলিত হয়েছিল একথা দ্বারা যে, আবু মিহজান বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! আমি আর কখনো মদপান করব না।" অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছিলেন, 'মদ পানের অপরাধে তোমাদের দেয়া শাস্তি (দোররা) বেত্রাঘাতের কারণে মদপান ত্যাগ করাটাকে আমি অপমানকর মনে করতাম, কিন্তু আজ যেহেতু তোমরা আমাকে মাফ করে দিয়েছো, তাই আল্লাহর কসম করে বলছি, বাকী জীবনে এ অভিশাপ কখনো আমি স্পর্শ করবো না।'

২. হযরত খালিদ বিন ওলিদ এর বনী জুহাইম গোত্রের সাথে কৃত অসৌজন্যমূলক আচরণে রসূলুল্লাহ স. প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন– 'আয় আল্লাহ, খালিদ যা করেছে এ কারণে আমি আপনার দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।' হযরত খালিদ বিন ওলিদ এর বিশাল সুকৃতির বিপরীতে একটি মাত্র অপরাধ ও মন্দ কাজে রসূল স. শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

বস্তুত বৃহত্তর মানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনে ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখিত মূলনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মূলনীতির তাৎপর্য ও দর্শন তাদের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব যারা ইসলামের আদেশ, নিষেধ প্রশংসনীয় ও শাস্তিযোগ্য বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তওবাকারীকে আল্লাহতাআলা যেমন আযাবে নিক্ষেপ করেন না, তদ্রুপ তওবাকারীর উপর হদও বাস্তবায়ন করা যায় না। বস্তুত অল্লাহ্ তাআলা নিজেই তো সেইসব শক্রসেনা ও ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িতদের অপরাধ ও দণ্ড মওকুফ করে দিয়েছেন, যেসব শক্রসেনা মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের আগেই তওবা করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আর কুরআনের এ নির্দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কঠিন অপরাধ ও গোনাহ্ যদি তওবার দ্বারা এবং আত্ম সমর্পনের দ্বারা মাফ হয়ে যায়, আর যুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক কাজের শাস্তি যদি ক্ষমাযোগ্য হতে পারে তবে এর চেয়ে লঘু অপরাধের শাস্তিতো সত্যিকার তওবা ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার মতো সুকৃতির দ্বারা ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হওয়া উচিত।

৩. নাসাই শরীফে বর্ণিত হয়েছে। রসূল স. এর যুগে ভোরের অন্ধকারে ফজরের নামায পড়ার জন্যে মসজিদে যাচ্ছিল জনৈক মহিলা। পথে তার উপর হামলে পড়লো এক লোক। লোকটি তার শ্লীলতাহানি ঘটাতে শুরু করল। মহিলা আর্তচিৎকার করতে লাগল এবং তার পাশ দিয়ে গমনকারী এক ব্যক্তিকে সাহায্য করার অনুরোধ জানাল। সে ব্যক্তি যখন মহিলার কাছে পৌঁছল, হামলাকারী পালিয়ে গেল। সাহায্যকারী লোকটি হামলাকারীর পিছু ধাওয়া করল। ইত্যবসরে আক্রান্ত মহিলার কাছে আরো ক'জন লোক পৌঁছুল। এ লোকদের কাছেও সাহায্যের আবেদন করলো মহিলা। এরাও মহিলার ফরিয়াদ শুনে অপরাধীকে ধরার জন্যে দৌড়াল। আক্রান্ত মহিলার সাহায্যকারী দলের লোকেরা একক সাহায্যকারী ব্যক্তিকে দৌড়াতে দেখে সবাই তার পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনল। কিন্তু লোকটি তা অস্বীকার করে বলল, 'আমি তো মহিলার সাহায্যকারী। অপরাধীকে ধরার জন্যেই আমি তাকে ধাওয়া করছিলাম।' কিন্তু অন্যেরা তা বিশ্বাস করল না। তাকে মহিলার কাছে ধরে নিয়ে এলো। কিন্তু অভিযুক্তের নিরপরাধ হওয়ার আর্তি এবং প্রকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তির পালিয়ে যাওয়ার কথা কেউ বিশ্বাস করল না। অবশেষে তাকে ধরে নবী করীম স. এর দরবারে নিয়ে এলো।

রসূল-এর দরবারে মহিলা নিজেই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, 'এ লোক আমার শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে। অন্যেরাও বলল, পলায়নরত অবস্থায় আমরা তাকে পাকড়াও করেছি। অভিযুক্ত লোকটি নবীজীর কাছে বলল, 'আসলে আমি আক্রান্ত মহিলার সাহায্যের জন্যে এসে পলায়নকারী অপরাধীকে ধরার জন্যে ধাওয়া করেছিলাম কিন্তু এ লোকেরা আমাকে দৌড়াতে দেখে অপরাধী ভেবে ধরে নিয়ে এসেছে।'

একথা শুনে মহিলা বলল, 'না, সে মিথ্যা বলছে। আসলে সেই আমার শ্লীলতাহানি করেছে।'

নবীজী বাদী বিবাদী ও পাকড়াওকারীদের যবানবন্দী শুনে নির্দেশ দিলেন 'যাও, প্রস্তরাঘাতে এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর।' এমন সময় সমবেত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'না, ওকে নয় আমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেল। কারণ সে নয় আমি মহিলার শ্লিলতাহানি করেছি।'

বস্তুত তখন তিনপক্ষ নবীজীর সামনে দণ্ডায়মাণ। ১. প্রকৃত অপরাধী যে অপরাধ করেছে, ২. যে প্রথম আক্রান্ত মহিলার সাহায্যের জন্যে তৎপর হয়েছিল। ৩. আক্রান্ত মহিলা।

নবীজী মূল অপরাধী (আত্মস্বীকৃত অপরাধী)কে বললেন, তোমাকে আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও সাধুবাদ দিলেন। এ সময় হযরত ওমর আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আত্মস্বীকৃত ব্যভিচারীকে শাস্তি দিন। কিন্তু নবীজী ওমরের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বললেন, সে আল্লাহ্র কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে গেছে।

এ ঘটনা উদ্ধৃত করে আল্লামা ইবনে কাইয়েম একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের অবতারানা করেন, নবীজী অপরাধের স্বীকারোক্তি ছাড়াই এবং সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ার পরও কেন প্রথম সাহায্যকারী ব্যক্তিকে শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন? এর জবাব হলো, নবীজী স. এর এ ফয়সালাটি ফৌজদারী ও বাহ্যিক পরিস্থিতি নির্ভর ফয়সালার পর্যায়ভুক্ত। এবং ফৌজদারী ও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফয়সালার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় প্রমাণ। ইবনে কাইয়েম ঘটনাটিকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে পরিশেষে বলেন, নবীজী স. এর ফয়সালা আইনের দৃষ্টিতে যথার্থ এবং সঠিক ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই মূলনীতির উল্লেখ করেন– আইনের প্রয়োগ ও ফয়সালা বাহ্যিক বিষয়াদির উপর নির্ভর করে সম্পাদিত হবে।

সবশেষে আল্লামা ইবনে কাইয়েম বলেন, রসূল স. এর আত্মস্বীকৃত যিনাকারীর 'হদ' মওকুফ করে দেয়ার ব্যাপারটি স্বভাবতই প্রশ্নের জন্ম দেয়। যে কারণে হযরত ওমর রা. এর মতো বিচক্ষণ দূরদর্শী ব্যক্তিও যে ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ দেয়ার আবেদন করেন সে ক্ষেত্রে রসূল স. এর দণ্ডাদেশ না দেয়ার কারণটি অধিকাংশ ফকীহ্দের কাছেও বোধগম্যের বাইরে মনে হতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মস্বীকৃত যিনাকারী ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী হলেও আল্লাহ্র দয়ার অযোগ্য নয়। আল্লাহ্র দয়ার ভাণ্ডারে তার ক্ষমার অবকাশ ছিল। তাই সে খাঁটি মনে তওবা করে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার পরও নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি ভোগ করার জন্যে নিজেকে পেশ করার দ্বারা প্রমাণ করে যে সে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে উদগ্রীব। একমাত্র পূর্ণ তাকওয়াই পারে

আত্মস্বীকৃতিতে উদ্বুদ্ধ করতে। বস্তুত সে আত্মস্বীকৃতি দিয়ে খাঁটি মন ও তাকওয়ার যে বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে তা তার অপরাধকেও ছাপিয়ে গেছে। নিরপরাধ একজন মুসলমানের জীবন রক্ষা করেছে তার স্বীকারোক্তি। সে অন্যজনের জীবনকে নিজের জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে বলা যায়– মন্দ কাজ ভাইরাসের মত, ভালো কাজ ওষুধ হিসেবে তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে। এমতাবস্থায় রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকায় ভাইরাস অবদমিত হয়ে যায় এবং রোগী আবার পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে নবী করীম স. এর আদালত থেকে ফয়সালা দেয়া হয় এখন আর আমরা রোগী বা অপরাধীকে অপারেশন কিংবা শাস্তি দিতে চাই না। কারণ অপারেশন বা শাস্তিতো দেয়া হবে সুস্থ কিংবা পবিত্র করার জন্যে। সে তো ইতোমধ্যে সুস্থ বা পবিত্র হয়ে গেছে। অতএব পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নেই। শাস্তি বা অপারেশন ছাড়াই যেহেতু অপরাধী অপরাধমুক্ত হয়ে গেছে রোগী সুস্থ হয়ে গেছে তাই আমরাও তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে আর কাটাছেঁড়া করবো না, শাস্তি দেব না। দেখুন, রসূল স. এর এই ফয়সালার চেয়ে বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর আর কোন্ ফয়সালা হবে? যে ফয়সালায় দয়া মমতা, মানবিকতা, প্রজ্ঞা ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে?

মঙ্গা পীড়িত অবস্থায় চুরির হদ (দণ্ড) মওকুফ হওয়ার বিভিন্ন কারণ

হযরত ওমর রা. মঙ্গা ও তীব্র খাদ্যাভাবের সময় চুরির বিধান প্রয়োগ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, খাদ্যাভাব ও মঙ্গাপীড়িত অবস্থায় খেজুর চুরি ও অন্যান্য চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।

বিখ্যাত ফকীহ সাদী বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল র.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারও কি এ অভিমত ? বললেন নিসন্দেহে। আমি পুণর্বার জিজ্ঞেস করলাম, খাদ্যাভাব কিংবা মঙ্গাপীড়িত অবস্থায় কেউ যদি চুরি করে তাহলে কি চুরির অপরাধে আপনি হাত কাটবেন না? আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন, 'খাদ্যাভাব ও মঙ্গা দূর না হওয়া পর্যন্ত অভাব ও পরিস্থিতির তাড়নায় যদি কেউ চুরি করে তাহলে আমি তাকে হাত কাটার শাস্তি দেব না।'

আস্‌সাদী বলেন, হযরত ওমর রা. হাতিব এর গোলামদের ব্যাপারে যে ফয়সালা হয়েছিল সে ঘটনাও এ ফয়সালার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। ঘটনা হলো, হাতিবের ক'জন গোলাম মুযাইনা কবিলার এক ব্যক্তির উষ্ট্রী চুরি করে ধরা পড়লে তাদেরকে ওমরের দরবারে হাজির করা হয়। গোলামরা ওমরের কাছে চুরির কথা স্বীকার করে। হযরত ওমর হাতিবের ছেলে হযরত আবদুর রহমানকে ডেকে ঘটনা শোনালেন এবং কাছির ইবন সালাতকে গোলামদের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। হাত কাটার জন্যে গোলামদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর হযরত ওমরের চিন্তা বদলে গেলো তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি মওকুফ করে হাতিবের ছেলের উদ্দেশ্যে ড়াললেন।

'তোমরা এসব অসহায় লোকদের দিয়ে কাজ করাও। কিন্তু পানাহারে এদেরকে এমন কষ্ট দাও যে এরা যদি কষ্টের যাতনায় কোন হারাম বস্তুও খেয়ে ফেলে তাহলে তা এদের জন্যে জায়েয বিবেচিত হবে। আল্লাহর কসম! আমি এ বিষয়টি না জানলে তাদের হাত কেটে দিতাম। কিন্তু এখন ওদের হাত কাটার পরিবর্তে তোমাদের উপর এমন কঠিন জরিমানা ধার্য করবো যা তোমাদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

এরপর হযরত ওমর মুজাইনীর কাছে উষ্ট্রীর দাম জানতে চাইলেন। ওমরের জবাবে মুজাইনী জানালেন, উষ্ট্রীর দাম চারশ দিরহাম হতে পারে। হযরত ওমর গোলামদের মালিককে আটশ দিরহাম জরিমানা দেবার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল উভয় ক্ষেত্রেই হযরত ওমরের রা. মতামত অবলম্বন করেন।

ভাষান্তর ও সংক্ষেপকরণ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আলহাজ্জ বদিউল আলম

ইসলামী আইন বা শরীয়াহ হলো মানব জাতিকে এই বিশ্বে ইহকাল ও পরকালের সোজা পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত একটি প্রক্রিয়া। উত্তম ও চিরস্থায়ী পরজগতের স্বার্থের আলোকেই এই বিশ্বের বিষয়াদির জন্য আল্লাহ পাক বিধানটি প্রণয়ন করেছেন। এ জন্যই আল্লাহর আইন ও মানব রচিত আইনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দীনই হলো উপযুক্ত সু-সঙ্গত (Cohesive) পূর্ণ শক্তি। শরীয়াহ মানুষের মনকে বিশেষ করে মানুষের শৃঙ্খলা রক্ষায় অধিক কার্যকর।

শরীয়তে আত্মার পরিশুদ্ধির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, নামায প্রতিষ্ঠা, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান ও হজ্ব ব্রত পালনের উদ্দেশ্যই হলো আত্মার পরিশুদ্ধি, স্বার্থপরতার কু-প্রভাব বিদূরণ।

শরীয়াহ হলো সমতা ও অনুকম্পার আইন। ইচ্ছাকৃতভাবে খুনের ক্ষেত্রে কিসাস বা সমতার আইন প্রযোজ্য এবং ভুলক্রমে বা দুর্ঘটনা ও নরহত্যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কিসাস এর বিধান আল-কুরআনে রয়েছে। তা খুনের বিধান অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির মাতা, পিতা, ভাই, বোনদের অবর্তমানে রক্ত সম্পর্কীয় তাদের আত্মীয়-স্বজন খুনের বদলা নিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন খুনের বিচার করে খুনিকে মৃত্যুদন্ড দেয় তখন নিহত ব্যক্তির ঐ আত্মীয় স্বজনেরা অনুকম্পা করে যদি ক্ষমা করে দেয় তখন মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত ব্যক্তির উপর দন্ডাদেশ কার্যকর করা হয় না। অনুকম্পার আওতায় ওকে ছেড়ে দেয়া হয়। সৌদি আরবে সেই বিধান বর্তমানে বলবৎ রয়েছে।

আল্লাহর এই বিধানে সর্বাধিক বাস্তবতা রয়েছে। আমার ৪৭ বছরের ওকালতি জীবনে দেখেছি যে, প্রথমে খুনের মামলায় খুব তোড়জোড় থাকে, পরবর্তীতে রক্তপন আদায়ে বা অন্য কোন কারণে খুনিকে খুনের দায় থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য বাদী পক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আইনে অনুকম্পার কোন বিধান নেই। সে কারণে আমরা সাক্ষ্য প্রমাণ ভিন্ন খাতে চালিয়ে দিয়ে থাকি।

কিসাসের এই বিধান আমাদের ফৌজদারী আইনে থাকা যুগোপযোগী। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, আত্মসাৎ, ব্যভিচার বা সন্ত্রাসের ব্যাপারে এই আইন প্রযোজ্য নয়। কারণ ঐ সব অপরাধের সাথে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত। আল্লাহ পাক এই সব

লেখক : সাবেক সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা- আইনজীবি সমিতি।

অপরাধের ব্যাপারে সমতা ও অনুকম্পার বিধান রাখেননি। কারণ সমম্পদের মালিক মানুষ। কিন্তু জীবনের মালিক আল্লাহ।

ইসলামী আইনের বিচারে বলা হয় এহসান এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতি শুক্রবার খুতবায় বলা হয়, 'ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল এহসান', আমাদের প্রচলিত আইনের বিচারে এহসান খুব একটা হয় না। সেই কারণে লোকে বলে দেশে বিচার নেই। একটি ফৌজদারী মামলা কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ হতে এক যুগ দুই যুগ লাগে। বাদীপক্ষ এবং আসামী পক্ষ প্রায় ক্ষেত্রে সর্বশান্ত হয়ে যায়। শুধু লাভের মধ্যে থাকে মামলাবাজ ও ধনাঢ্য কুচক্রিরা, টাউট প্রতারকরা। কোন কোন দেওয়ানী মামলা নিস্পত্তিতে এক পুরুষ দুই পুরুষেরও বেশী সময় চলে যায়। ইসলামী আইনে নাবালিকা কিংবা সাবালিকা বিবাহ ছাড়া পর পুরুষের সাথে যৌনাচার গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য। এর জন্য ব্যভিচারের অপরাধে গুরুদন্ড রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে বৃটিশ রচিত প্রচলিত আইনে, সাবালিকা যে কোন মহিলা স্বেচ্ছায় যৌনাচার করলে তা ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে না এবং এটি দন্ডণীয় অপরাধও নয়। ধর্ষণ বা রেপ এবং Adultary সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি বিধান যা দন্ডবিধি আইনে আছে তা নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। আমাদের আইন প্রণেতারা আইন সংশোধন করে যৌনাচারকে দন্ডণীয় অপরাধের পর্যায়ে ফেলার জন্য এ পর্যন্ত কোন আইন প্রণয়ন করেননি। দন্ডবিধির ৪৯৮ ধারায় একজন স্ত্রীলোক পরপুরুষের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হলে তার কোন অপরাধ নেই, এটা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না, অপরাধ দুজনেরই।

আমাদের দেশে মুসলমানদের বিবাহ, তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোশ, দেনমোহর, মাতা-পিতার পরিচয় ও স্বীকৃতি দান, ওয়াকফ, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি Mohammadan Law এর আওতায় আছে। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় বিচার ব্যবস্থা শুধু মুসলমানদের জন্য কল্যাণধর্মী হয়নি, অন্য ধর্মাবলম্বীর নিকটও এর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েই চলছে।

যে বিজ্ঞান হতে শরীয়ার অনুশাসন ও মূল্যবোধগুলো ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয় তাই ফিকাহ শাস্ত্র। ফিকাহ হল মুসলিম আইনের গবেষণা ও চিন্তাধারার ফসল। বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র নয় বটে তবে মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম আইনের গড়োষণা এবং চিন্তা ভাবনার ফসল দ্বারা আমরা মানব জাতির অশেষ উপকার নিশ্চিত করতে পারি। জাগতিক সমস্যা সমমাধানেও অবদান রাখতে পারি।

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

ইসলামী শরীয়া আইন অপরাধ ও শাস্তির শ্রেণী বিন্যাসে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ইসলামী শরীয়া কয়েকটি অপরাধ বিষয়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছে এবং এসব অপরাধের শাস্তিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উল্লেখিত অপরাধ ও শাস্তিসমূহের কোনটাকে ইসলামী আইনে বলা হয় 'হদ' আবার কোনটাকে বলা হয় 'কিসাস'।

হদ ও কিসাস ছাড়া অপরাপর সব অপরাধে ইসলামী শরীয়া সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি। এসব ক্ষেত্রে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা শাসক ও বিচারকদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছে, যাতে বিচারক কিংবা প্রশাসক অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন। এই শ্রেণীভুক্ত সকল অপরাধকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হয়। শাস্তিযোগ্য অপরাধের ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা সেইসব অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করব যে সব অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ইসলামী আইনের অপরাধ ও শাস্তির মূল দর্শন বোঝা সহজ হবে এবং বলা সম্ভব হবে ইসলাম বিভিন্ন অপরাধে শাস্তির মাত্রা বিভিন্ন করেছে কেন?

হদ-এর আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ

হদ ও তাযীর এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী শরীয়া অপরাধ ও শাস্তির শ্রেণী বিন্যাসে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। অপরাধের মধ্যে কিছু অপরাধ এমন রয়েছে যেগুলোর দণ্ডবিধি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক দণ্ডবিধিকে 'হদ' আবার কিছু সংখ্যককে কিসাস বলে অভিহিত করেছে। এ ছাড়া অপরাপর যেসব অপরাধ রয়েছে সেগুলোর জন্যে শরীয়া নির্দিষ্ট কোন দণ্ডবিধি উল্লেখ করে নি। এ ক্ষেত্রে শাসক কিংবা বিচারক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; তারা অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের মাত্রা অনুধাবন করে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবেন। এসব দণ্ডবিধানকেই ইসলামী আইনে তাযীরাত বলা হয়। এগুলোই আমাদের আলোচনার বিষয়।

তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও সুনির্দিষ্ট দণ্ডবিধি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি, যাতে করে ইসলামী শরীয়ায় বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন দণ্ড প্রয়োগের যৌক্তিকতা বুঝা সহজ হয় এবং অনুধাবন করা

সম্ভব হয় বিভিন্ন অপরাধের মাত্রা ও দণ্ডের তারতম্যের কারণ। এরপর ইসলাম শরীয়ায় বিচারের এই পদ্ধতি প্রয়োগের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

হদ (দণ্ড) যোগ্য অপরাধ

হদ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ রোধ করা। কোন কোন শাস্তিকে হদ বলা হয়েছে এ জন্য যে, শরীয়তের দণ্ড হদ এসব অপরাধকে রোধ করে।

ফকীহগণ হদ এর সংগায় বলেছেন, হদ একটি নির্দিষ্ট দণ্ড যা আল্লাহর হক হিসেবে পালন করা ওয়াজিব। এ সংগা থেকে বুঝা যায় হদযোগ্য অপরাধগুলোর দণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত এবং আল্লাহর হক হিসেবে তা বাস্তবায়ন ও পালন করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহর (শরীয়া প্রবর্তক) পক্ষ থেকে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে সব অপরাধ ও দণ্ডাবাধ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রনিধানযোগ্য।[১]

যে সব অপরাধে হদ ওয়াজিব সেগুলো হল চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, মদ্যপান, ধর্মদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অবশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। আমরা এখন এসব অপরাধের দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোচনা করব।

চুরি

ফকীহগণের দৃষ্টিতে চুরি বলা হয় : যখন কোন বুদ্ধিমান, বালেগ, সুস্থ ব্যক্তি কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ ছাড়া সজ্ঞানে, স্বপ্রনোদিত হয়ে অপর কোন ব্যক্তির এমন সম্পদ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হাতিয়ে নেয় যা অস্থাবর মূল্যবান এবং সুরক্ষিত স্থানে রক্ষিত। এবং সম্পদটি মূল্যমানের ভিত্তিতে হাত কর্তন হওয়ার নেসাব পরিমাণ হয়। এ ধরনের পরধন হাতিয়ে নেয়াকে ইসলামী আইনে চুরি বলে অভিহিত করা হয়।

এ সংগা থেকে বুঝা যায় চুরির অন্যতম শর্ত হলো চোরের জ্ঞান থাকতে হবে, তাকে হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং চুরিকৃত সম্পদের ন্যূনতম নেসাব পরিমাণ মূল্যমান থাকতে হবে এবং সম্পদটি অবশ্যই সুরক্ষিত জায়গায় থাকতে হবে আর সেই সাথে তা হাত কর্তনযোগ্য নেসাবের সমপরিমাণ হতে হবে।

চুরির দণ্ড কুরআনে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা- "চোর নারী পুরুষ যেই হোক তার হাত কেটে দাও; এটাই তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। (সূরা : আল-মায়েদা, আয়াত-৩৮)

অধিকাংশ ফকীহ এ ব্যাপারে একমত যে এ আয়াতে চুরির শাস্তি হিসেবে যে হাত কর্তনের কথা বলা হয়েছে, এর মর্মার্থ হলো- ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা। খারেজীরা বলেন, হাত কর্তনের দ্বারা কাঁধ পর্যন্ত কর্তনের কথা বলা হয়েছে। কারণ হাতের আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত সবটাকেই হাত বলা হয়। এর বিপরীতে অন্যেরা এও

বলেছেন, এক্ষেত্রে হাত কর্তনের বেলায় শুধু আঙুল কর্তন করাই হবে সমীচীন। কেন না আঙুল দিয়ে ধরার কাজ করা হয়। অবশ্য এই ব্যাখ্যা প্রকাশ্য নসের প্রামাণ্য দলীলের পরিপন্থী। কারণ কুরআন করীমের আয়াতে পরিষ্কার হাত কর্তনের কথা উল্লেখ আছে আঙুল কর্তনের কথা নেই। হাতের ব্যবহার কোন কোন সময় কব্জি পর্যন্ত হয়, কখনো কনুই পর্যন্ত হয় আবার কোন সময় কাঁধ পর্যন্ত হয়। এসব সংশয় হাদীসের সাহায্যে দূর হয়ে যায়। রাসূল স. ইরশাদ করেছেন, 'চোরের হাত কব্জি পর্যন্ত কাটা উচিত।' কুরআন করীমের নস দ্বারাও এ কথাই সুস্পষ্ট হয়। অতএব এ হাদীসকেই প্রামাণ্য হিসেবে ধরে নিতে হবে। কারণ শাস্তির বেলায় যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় তাকে প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।[২]

ডাকাতি

ডাকাতির দণ্ডাদেশের ব্যাপারে মূল বিধান এই আয়াত- "যারা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা অথবা বিপরীত দিকের হাত পা কেটে দেয়া অথবা তাদেরকে দেশান্তর করা। এটাই দুনিয়ায় তাদের জন্যে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্যে পরকালে তো বড় শাস্তি রয়েই গেছে।" সূরা- (আল-মায়েদা, আয়াত-৩৩)

অবশ্য কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এ আয়াত নবী স. এর যুগে যারা মুরতাদ হয়েছিল তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এরা মুরতাদ হয়ে রাসূল স. এর উটসহ অন্যদের উটও নিয়ে গিয়েছিল। এই অপকর্মের জন্য তাদেরকে ধরে এনে বিপরীত দিকের হাত পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এবং তাদের চোখ গরম শলাকা দিয়ে ফুটো করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মত হলো, এই আয়াতে ডাকাত ও পথদস্যুদের শাস্তির বিধানাবলী নাযিল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকিহের কথাই ঠিক। কেননা এ আয়াতের পর আরো ইরশাদ হয়েছে- "কিন্তু যারা তাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই তওবা করেছে তাদের হাত পা তোমরা কাটবে না।" (সূরা- আল-মায়েদা, আয়াত-৩৮)

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পথদস্যু ও ডাকাতদের তওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন গ্রেফতার হওয়ার আগেই তারা তওবা করে সৎপথে ফিরে আসার অঙ্গীকার করবে। এ শর্ত কাফেরদের তওবা কবুল করার ব্যাপারে নয়; যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ব্যাপারে।

বস্তুত মুহারাবা বা যুদ্ধ করার বিষয়টি নিয়েই মতভিন্নতা রয়েছে। ফকীহদের দৃষ্টিতে মুহারাবা বলতে বোঝানো হয়েছে শহরের আবাসিক এলাকার বাইরে রাজপথে সশস্ত্র ডাকাতি করা (অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করা)। এই ধরনের অপরাধীর উপর হদ্দ ওয়াজিব।

সশস্ত্র অবস্থা ছাড়া সাধারণ নাগরিক ও অধিবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা মুহারাবা কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে ধারালো ও ক্ষতিকর অস্ত্র ছাড়া গোলযোগ সৃষ্টিকারীকেই মুহারিব বলা হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, ধারালো ও ক্ষতিকর অস্ত্রধারণ করাটাই হবে মুহারিবের পর্যায়ভুক্ত। অন্যরা বলেন, মুহারাবা আসলে ধারালো অস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং ক্ষতিকর যে কোন জিনিস (যেমন লাঠি, হকিস্টিক, রড) দিয়ে গোলাযোগ বাধানোই মুহারাবা। অবশ্য অধিকাংশ ফকিহ্ যা গ্রহণ করেছেন তাই সঠিক মত। তা হলো, কেউ যদি অনেক সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্যে হামলা করে, হামলাকারী অস্ত্র হিসেবে যাই ব্যবহার করুক, তার হাতে লাঠি, বন্দুক, দা, কিরিচ যাই থাকুক না কেন, যা দিয়ে অন্যকে ঘায়েল করা যায়, তাতেই সে মুহারিব বলে বিবেচিত হবে এবং তার বিরুদ্ধে অত্যাচারী আঘাতকারীর সব দণ্ড প্রযুক্ত হবে।

এখন রইল আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির বিষয়টি। ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির কারণেই সে ত্রাস সৃষ্টির দণ্ডে দণ্ডিত হবে না। ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ মত হলো আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী অবশ্যই মুহারিবের দণ্ডে দন্ডিত হবে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও কোন কোন হানাফী ফকীহ'র মতও তাই। তারা মনে করেন, আবাসিক এলাকায় ত্রাস সৃষ্টির অপরাধকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ মনে করাই উত্তম। কেননা, আবাসিক এলাকা হবে শান্তি নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য সহমর্মিতা ও সহযোগিতার কেন্দ্র। এমন জায়গায় শক্তি প্রয়োগ করে লুটতরাজ করা অপরাধ প্রবণতা হিংস্রতার আলামত। এসব কর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দানের দাবী করে।

এ প্রেক্ষিতে এ কথাও বিবেচ্য যে আবাসিক বাড়িঘরে ডাকাতিকালে অনেক ডাকাত ঘরের দামী দামী জিনিস নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে পথদস্যুদের তুলনায় এরা বেশি ক্ষতিকর। কারণ রাস্তাঘাটে মানুষ খুব বেশি ধন সম্পদ বহন করে না। এ কথাও স্পষ্ট যে শহরের ভিতরে আবাসিক এলাকায় ডাকাতিকারী পথের কাফেলা লুণ্ঠনকারীদের অপেক্ষায় বেশি দুঃসাহসী।[৩]

ডাকাতি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, ডাকাতির বিষয়টি ব্যাপক। এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতের রকম ভেদে বিধানও বিভিন্ন হবে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মহাসড়ককে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে কিন্তু সে কাউকে হত্যা করে নি এবং কারো ধন-সম্পদ লুটও করেনি শুধু এক ধরনের ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে, তা হলে তাকে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্যে দেশান্তর করা হবে। এ ক্ষেত্রে যদি ত্রাস সৃষ্টিকারী কারো ধন-সম্পদ লুট করে থাকে তাহলে তার ডান হাত ও বাম পা কেটে দেয়া হবে। আর কেউ যদি মহাসড়কে কাউকে হত্যা করে কিন্তু সম্পদ লুট করে নি তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

আর কেউ যদি মাল লুট করে ও পথিককে হত্যা করে তাহলে এর শাস্তির ব্যাপারে বিচারকের অধিকার রয়েছে ইচ্ছা করলে তিনি অপরাধীকে হাত পা কেটে শূলিতে

মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে হাত পা না কেটে শুধু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারেন।

ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, এমন অপরাধীকে হত্যা করা হবে কিন্তু শূলে চড়ানো হবে না। কেন না, হাত পা কেটে আবার শূলে চড়ালে এক অপরাধে দুবার শাস্তি দানের ব্যাপার ঘটে। দু'টি স্বতন্ত্র শাস্তি দু'টি ভিন্ন প্রেক্ষিতে হতে পারে। এখানে ভিন্ন দু'টি দণ্ডকে একই সাথে মেশানো হয়েছে।

ঈমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, ডাকাতরা যদি মহাসড়কে ডাকাতিকালে হত্যা করে এবং সম্পদ লুট করে তাহলে হত্যা করে শূলিতে চড়াতে হবে, আর যদি কারো ধনসম্পদ না নিয়ে থাকে তাহলে শুধু হত্যা করতে হবে। আর যদি শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করে থাকে, হত্যা না করে থাকে তাহলে ডান হাত আর বাম পা কেটে দেয়া হবে। আর যদি শুধু মহাসড়কে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকে তাহলে শুধু দেশান্তর করার শাস্তিযোগ্য হবে। এ মতামত ইমাম আবু হানিফার মতামতের খুবই কাছাকাছি।[৪]

ইমাম মালেক বলেন, ডাকাত যদি হত্যা করে তাহলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিচারকের হাত পা কেটে শাস্তি দেয়া কিংবা দেশান্তর করার অধিকার নেই। বিচারক এ ক্ষেত্রে শুধু শূলে চড়িয়ে অথবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারেন।

ইমাম মালেকের মতে ডাকাত যদি মহাসড়কে শুধু সম্পদ লুণ্ঠন করে থাকে, কাউকে হত্যা করে নি তাহলে বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড, হাত-পা কর্তন কিংবা শূলিতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে পারেন কিন্তু দেশান্তর করতে পারবেন না।

আর যদি তার দ্বারা শুধু মহাসড়কের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়ে থাকে কোন লুণ্ঠন, হত্যা সংঘটিত না হয় তাহলে বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ড, শূলিতে চড়িয়ে ফাঁসি অথবা হাত পা কর্তনের দণ্ডেদণ্ডিত করতে পারেন।

ইমাম মালেকের মতে দণ্ডাদেশগুলোতে বিচারককে যে কোন একটি বা একাধিক দণ্ড প্রয়োগের অধিকার দেয়ার অর্থ হলো বিচারককে অনুধাবন ও চিন্তা শক্তি প্রয়োগের অধিকার দেয়া। কারণ ডাকাত যদি এমন পর্যায়ের ব্যক্তি হয়ে থাকে যে, সে একজন নেতা, বহু লোকের উপর তার কর্তৃত্ব চলে, সে অপরাধ কর্মের একজন পরিকল্পনাকারী, তাহলে ইজতিহাদের দাবী এই হবে যে, তাকে হত্যা কিংবা শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দেয়া হবে। কারণ শুধু হাত পা কেটে দিলেই তার দ্বারা আর অপরাধ সংঘটিত হবে না এমনটি মনে করা যাবে না। কারণ হতে পারে যে সে ঠায় বসে নির্দেশ দিয়ে অন্যদের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত করবে। এমতাবস্থায় তার হাত পা কেটে দেয়ার দ্বারাই তার ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না, তাকে হত্যা করাই হবে নিরাপদ। আর সে যদি শুধু দু:সাহসী, শক্তিশালী ও আগ্রাসী হয়ে থাকে তাহলে হাত পা কেটে দিলেই তার

শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি ডাকাত উল্লেখিত দুই পর্যায়ের কোনটিতেই না পড়ে তা হলে তাকে শক্ত পিটুনি দিয়ে দেশান্তর করাটাই হবে যথেষ্ট।

কেউ কেউ বলেন, ডাকাতের দণ্ডাদেশের ব্যাপারে বিচারকের এখতিয়ার রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে উল্লেখিত চার শাস্তির যে কোন একটি প্রয়োগ করতে পারেন।

ডাকাতি ও মহাসড়কে দস্যিপনার অপরাধে উল্লেখিত দণ্ডাদেশ সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা করবে, সে অনুধাবন করতে পারবে ডাকাতির ক্ষতিকারিতার প্রভাব কতো ব্যাপক। ডাকাতি ও লুণ্ঠণের কারণে জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, পর্যটকদের মধ্যে আতংক বিরাজ করে। তাদের ছড়ানো আতংক সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে ইত্যাকার ক্ষতি ও ব্যাপকতার বিষয়টি চিন্তা করলে কেউ এমনটি বলবে না যে, ইসলামী শরীয়া ডাকাতি ও দস্যুতা দূরীকরণে ডাকাত ও দস্যুদের যে শাস্তি বিধান করেছে তা খুব বেশি কঠিন ও অমানবিক।

অবশ্য কোন কোন ফকীহ্ কুরআন মজিদে বর্ণিত শাস্তিসমূহ প্রয়োগের ব্যাপারে বিবেচনা অবলম্বনের পক্ষে। তাদের কথা মেনে নিলে শাস্তি নির্ধারণের ক্ষমতা আরো ব্যাপকতর হয়। যেমন কোন কোন অপরাধী এমন রয়েছে মৃত্যুর হুমকি তাকে ভীত করে না, কিন্তু হাত পা কেটে দেয়ার হুমকি তার মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে। এমন অপরাধীরা যদি হাত পা কাটা অপরাধীদেরকে চোখের সামনে দেখতে পায় তাহলে সেই অপরাধ থেকে ফিরে আসার প্রতি আগ্রহী হবে। পক্ষান্তরে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তের মৃত্যু অধিকাংশ মানুষই ভুলে যায়। অনেক আত্মাভিমানী লোক রয়েছে যারা হাত পা কর্তনের চেয়ে মৃত্যুকে ভয় পায়। বস্তুত সেই দণ্ডই তো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় যা মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। তাতেই শাস্তির সার্থকতা।

ব্যভিচার

ইমাম আবু হানিফা শাস্তিযোগ্য ব্যভিচারীর সংগা এভাবে করেছেন– এমন কোন জীবিত নারীর সাথে যৌনিদ্বারে সঙ্গম করা যে নারী তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা মালিকানাধীন বাঁদী নয় এবং মালিকানাধীন বাঁদী হওয়া কিংবা বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার মতো কোন সন্দেহের অবকাশও এ ক্ষেত্রে নেই।

নারীকে তখনই ব্যভিচারিনী বলা যাবে যখন সে স্বেচ্ছায় এমন পুরুষকে সঙ্গমে সম্মতি দেবে।

অন্যান্য ফকীহগণের সংগাও এর কাছাকাছি তবে একটু পার্থক্যও আছে। হাম্বলীও শাফেয়ীগণ পায়ুদ্বারে সঙ্গমকেও ব্যভিচারের অন্তরভুক্ত মনে করেন।

বিবাহিত ও অবিবাহিতের যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি : অবিবাহিত পুরুষের যিনার ব্যাপারে সর্ব সমর্থিত মত

হলো, তাকে বেত (দোররা) মারা হবে। এ ব্যাপারে সরাসরি কুরআন করীমে ঘোষিত হয়েছে– ব্যভিচারীনী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কেই একশ বেত্রাঘাত (দোররা) করো।'

অবিবাহিতকে শ' দোররা মারার পাশাপাশি দেশান্তরও করা হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

ইমাম আবু হানিফা র. মতে অবিবাহিত নারী পুরুষকে শুধু একশ দোররা মারা হবে আর কিছু নয়। হ্যাঁ, বিচারক যদি মনে করেন যে, তাকে সংশোধনের স্বার্থে দেশান্তর করা দরকার তাহলে বিচারক তা করতে পারবেন।

ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিতে ব্যভিচারীকে এক শ' দোররা মারার সাথে সাথে দেশান্তর করাও ওয়াজিব। তিনি আরো বলেন, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী উভয়কে কোন ভেদাভেদ না করে এক বছরের জন্যে দেশান্তর করতে হবে। এই দেশান্তরের অর্থ হলো, তাদেরকে এতটুকু দূরত্বে পাঠাতে হবে যেখানে যেতে অন্তত একদিন এক রাতের সময় লাগে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এ মত ব্যক্ত করেন। ইমাম মালিক র. বলেন, শুধু পুরুষকে দেশান্তর করা হবে, মহিলাকে নয়। ইমাম আওযাঈ র. ও এ মত ব্যক্ত করেন।

যারা শুধু দেশান্তরের কথা বলেন, তারা উবাদা ইবনুস সাবিত এর কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। উবাদা বলেন, নবী করীম স. ইরশাদ করেন, তোমরা আমার কাছে এর বিধান শোন। অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি একশ' দোররা এবং এক বছরের দেশান্তর। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে একশ দোররা মারার পর পাথর নিক্ষেপে হত্যা দণ্ড কার্যকর করতে হবে। তারা আবু হুরাইরা ও খালিদ ইবনে জুহানীর বর্ণনা দলীল হিসেবে পেশ করেন। সেই বর্ণনাটি হলো– একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূল স. এর কাছে এসে বলল, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমাদের জন্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন। সে সময় সেই ব্যক্তির প্রতিপক্ষও উপস্থিত ছিল। প্রতিপক্ষ ছিল প্রথমোক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। সে বলল, জী হাঁ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমাদের ফয়সালা করুন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। নবী করীম স. ইরশাদ করেন, বলো। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমার ছেলে তার ওখানে মজদুরী করে এমতাবস্থায় সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমাকে কোন একজন বলল, তোমার ছেলের শাস্তি হলো 'প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড'। এ কথা শুনে নালিশ না করার জন্যে আমি তাকে একশ' বকরী ও একটি দাসী দান করেছি। অত:পর জ্ঞানী লোকজনকে আমি জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়– আমার ছেলের শাস্তি হলো, একশ' দোররা ও এক বছরের দেশান্তর। এ ক্ষেত্রে প্রস্তরঘাতের শাস্তি সেই মহিলার।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শুনে রসূল স. ইরশাদ করেন, যে প্রভুর হাতে আমার জীবন আমি তার কসম করে বলছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মতো ফয়সালা

দেবো। বকরী ও দাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে অবশ্যই একশ দোররা মারা হবে এবং এক বছর দেশান্তর করা হবে।

ইমাম মালেক র. দেশান্তরকে অন্তরভুক্ত মনে করেন না। কারণ নারীকে দেশান্তর করলে তার চারিত্রিক স্খলনের আশংকা আরো বেড়ে যাবে। তাতে শুধু ব্যভিচারই নয় আরো মন্দকাজের সূত্রপাতও ঘটতে পারে। ইমাম মালিক র. এর এ অভিমত অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ইমাম মালিকের এই দলীল গ্রহণের নীতি খুবই প্রশংসনীয় হয়েছে।

হানাফীরা এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশের বাহ্যিক অর্থ প্রয়োগ করে। হানাফীরা বলেন, আয়াতে দোররা মারা ছাড়া আর কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। কাজেই দেশান্তরের ফয়সালা দানকারীরা কুরআনের দলীলের উপর আরো অতিরিক্ত যোগ করেছেন, যা প্রকৃত প্রস্তাবে বিকৃতির পর্যায়ভুক্ত।

এ কথা স্বতসিদ্ধ যে, কুরআনের কোন দলীলকে কোন এক ব্যক্তির খবরে ওয়াহিদ সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বাতিল করা যায় না। শাফেয়ীগণ যে দলীল পেশ করেন, তা একজন মাত্র সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হানাফীগণ হযরত ওমর রা.সহ আরো অনেক সাহাবায়ে কেরামের কর্মকাণ্ডকে এর পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। সেসব ক্ষেত্রে এসব সাহাবী একশ' দোররা মারা ছাড়া দেশান্তরের শাস্তি প্রয়োগ করেন নি।

বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি : 'মুহসিন' ঐ ব্যক্তি যে বিবাহিত অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। এখানে আমি মুহসিন এর শর্তাবলী বর্ণনা করবো; অতপর বর্ণিত হবে মুহসিন তথা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক র. এর মতে প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধি সচেতন, স্বাধীন এবং বিশুদ্ধ বিবাহিত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং মুসলমান হওয়া মুহসিনের জন্যে শর্ত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী মুহসিন হওয়ার জন্যে মুসলমান হওয়া শর্ত মনে করেন না। যারা মুহসিন হওয়ার জন্যে ইসলামকে শর্ত মনে করেন, তাদের প্রমাণ হলো, ইহসান একটা সম্মান আর ইসলাম ছাড়া সম্মানের প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে বিপরীত মতের লোকেরা ইবনে ওমর এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। হাদীসটি ইমাম মালেক র. নাফে' সূত্রে বর্ণনা করেন। রসূল স. এক ইহুদী পুরুষ ও এক ইহুদী মহিলাকে ব্যভিচার করার কারণে প্রস্তর নিক্ষেপের শাস্তি দিয়েছিলেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে সবাই একমত।

যারা ব্যভিচারে মুহসিন হওয়ার জন্যে ইসলামকে শর্ত হিসাবে আরোপ করেন নি আমি তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেই। প্রথমত উল্লেখিত হাদীসের আলোকে দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের দণ্ডে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিষয়টি এক ধরনের শাস্তি ও আযাবও বটে। এটাতো হতে পারে না যে, একজন মুসলমান ইসলাম গ্রহণের কারণে আযাব ও শাস্তি উভয়টা ভোগ করবে আর অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে কোন শাস্তিই পাবে

না।

জমহুর ফকীহদের কাছেও বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অথবা বিকল্প এমন একটি শাস্তি প্রয়োগ করা। এই শাস্তি (বা হদ) সহী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জমহুর এ ক্ষেত্রে দোররা মারার আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে কর্মচারী তার মনীবের স্ত্রীর সাথে যিনা করে, তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় রসূল স. বলেন, 'উনাইস সেই লোকের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, সে যদি যিনার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দাও।'

উনাইস পরদিনই সেই মহিলার কাছে গেলে মহিলা ব্যভিচারের কথা স্বীকার করলেন, তাই রসূলের নির্দেশে তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অনুরূপভাবে মুঈয এর ঘটনায় বলা হয়েছে– তিনি যিনা করার পর রসূল স. এর কাছে গিয়ে স্বীকার করলে তিনি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। গামেদিয়ার ঘটনাও অনুরূপই ঘটে। তিনি রসূল স. এর কাছে যিনার স্বীকারোক্তি করলে তিনি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেন। সর্বশেষ ঘটনা দুটি বহু মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো কুরআন করীমের নির্দেশকেই শক্তিশালী করে।

এ ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে যে, বিবাহিত ব্যভিচারীকে কি শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে, না এক শত দোররাও মারা হবে ? হাসান বসরী, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াহ এবং দাউদ জাহেরীর মতে আগে শত দোররা মারা হবে অতপর রজম করা হবে।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ-এর একাধিক মত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো বিবাহিত/বিবাহিতা যিনাকারীকে শুধু রজম করা হবে দোররা মারা হবে না। জমহুর ফুকাহাও এ মত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, রজম করার সাথে দোররা মারা যাবে না।

যারা রজমের সাথে দোররা প্রয়োগের কথা বলেন, তারা যিনা সংক্রান্ত আয়াতের অনির্দিষ্টতাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে তারা হযরত আলী র. এর একটি সিদ্ধান্তকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। ঘটনা মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো, হযরত আলী র. শোরাহা হামদানিয়াকে বৃহস্পতিবারে একশ' দোররা মারেন এবং জুমআর দিন রজম বাস্তবায়ন করে বলেন, অতপর আমি কুরআনের নির্দেশে দোররা কার্যকর করেছি এবং রসূলের সুন্নাহর নির্দেশে রজম বাস্তবায়ন করেছি। তিনি উবাদা বিন সাবিতের হাদীস দিয়েও দলীল দেন, যে হাদীসের উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

এর বিপরীতে জমহুরের দলীল হলো, রসূল স. গামেদিয়া, মুঈয ও জুহাইনিয়া গোত্রের এক মহিলাকে রজমের শাস্তি প্রদান করেন, কিন্তু এদের কাউকেই রজমের আগে দোররা প্রয়োগ করেননি। এ প্রেক্ষিতে বলা হয়, বিবাহিতের যিনার অপরাধে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে রজমের আগে দোররা প্রয়োগের শাস্তির বিধান রহিত হয়ে গেছে।

এ বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিবেচ্য, হদ প্রয়োগের আসল উদ্দেশ্য ভীতি সৃষ্টি করা, যাতে শাস্তির ভয়ে মানুষ এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে। বস্তুত রজমের সাথে এ ক্ষেত্রে দোররা প্রয়োগের দ্বারা ভীতির মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। আমার মতে, রজমের সাথে দোররা প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। কেননা, বিবাহিতের যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে কুরআন করীমের যে আয়াতের আলোকে দোররা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার মূলে রয়েছে বহু হাদীস, কোন একটি মাত্র হাদীসের দ্বারা পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় নি। বস্তুত রজম প্রয়োগের দ্বারা কোন ব্যভিচারীর শাস্তি প্রয়োগের পর সে ক্ষেত্রে আবার দোররা প্রয়োগ করা একটি বাড়তি সংযোজন ঘটে যা নিষ্প্রয়োজনীয়। (অসমাপ্ত)

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

তথ্য সূত্র

১. মুতাবায়্যিনুল হাকায়িক : শারহে কানযুদ্ দাকায়েক। ইমাম যাইলাঈ, ৩য় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ : মাতবায়ে আমিরিয়্যাহ, বুলাক-মিসর ১৩১৩ হিঃ
'হদ' আল্লাহর হক বা অধিকার হওয়ার ভিত্তি কি ? এ বিষয়টি বুঝার জন্য, আগে বুঝতে হবে, অপরাধের দ্বারা যে অধিকার লংঘিত হয় তা দু'ধরনের। (১) আল্লাহর অধিকার বা হক পাশ্চাত্য আইনের দৃষ্টিতে যাকে Public Right বলা হয় এবং (২) বান্দার হক বা নাগরিক অধিকার যাকে পশ্চিমা জগত Private Right বলে অভিহিত করে।
কোন অধিকার বা হককে আল্লাহর হক তখনই বলা যাবে যখন এটি একান্তই আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা আল্লাহর অধিকার বেশি হবে। এর বিপরীতে নাগরিক বা ব্যক্তি অধিকার কোন জিনিসকে তখনই বলা যাবে যখন তাতে কোন ব্যক্তি বা মানুষের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে অথবা ব্যক্তি অধিকারের প্রাধান্য থাকবে।
ইসলামী শরীয়তে সাধারণ মানুষের কল্যাণে যে অপরাধের শাস্তির বিধান দেয়া হয় সেটিকে হক্কুলাহ বা আল্লাহর অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা। দাঙ্গা হাঙ্গামা রোধ কল্পে যে শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে তাকেও হক্কুল্লাহ বলা হয়। যে সব অপরাধের শাস্তি কুরআনুল কারীমে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলোকে আল্লাহর হক বলা হয়। কারণ এসব অপরাধ সংঘটিত হলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় পক্ষান্তরে অপরাধীকে শাস্তি দিলে এর দ্বারাও সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। এ জন্য দেখুন আত্তাশরিউল জিনায়ীল ইসলামী : আবদুল কাদের আউদাহ্ ১ম খণ্ড, ছাপা ১৩৬৮ হিজরী, কিসমে আম অধ্যায় পৃঃ ১৭৮।

২. ফাতহুল কাদির ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২০

৩. এটি জমহুরে ফুকাহার কথা। অনেকেই এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। দাউদ জাহেরী ও হাসান বসরী র. কম বেশি সব ক্ষেত্রেই হাত কাটার কথা বলেছেন। খারেজীদের মতও তাই। মুতাকাল্লিমীনের একটি দল এ অভিমতের

পক্ষে। যাহেরিয়া ও আহলে হাদীসের একটি অংশের মত হলো– নিসাব পরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে যদিও সম্পদটি সুরক্ষিত জায়গাতে রাখা ছিল না। এ জন্য দেখুন 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৭ প্রথম প্রকাশ ১৩২৯ খৃষ্টাব্দ, মাতবায়ে জামালিয়া এবং আল-আহকামুস সুলতানিয়া মাওয়ারদী পৃঃ ২১৪-২১৫ মাতবায়াতুল ওয়াতন, মিসর ১২৯৮ হিজরী

৪. আল মাবসূত, সারাখসী খণ্ড ৯ পৃঃ ১৩৩-১৩৪ প্রকাশ ১৩৩৪ হিজরী।

৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড ২য় পৃঃ ৩৭৯-৩৮০। মুঈনুল হুক্কাম ফিমা তারাদ্দাদু বাইনাল খাসামাইনে ফিল আহকাম, পৃঃ ১৮৫, প্রথম প্রকাশ আমিরিয়া বুলাক, মিসর ১৩০০।

৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ খণ্ড ২য় পৃঃ ৩৮০।

৭. আস্সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া পৃঃ ৩৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ইবনে রুশদ, খণ্ড ২- পৃঃ ৩৮০। ইবনে রুশদ লিখেন, ইমাম শাফেয়ী 'শাওকাত'কে সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করার জন্য শর্তারোপ করেছেন। অপরাধীদের সংখ্যা তার কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

   শাওকাত অর্থ হলো, আক্রমণকারীর কাছে আঘাত করার মতো শক্তি থাকতে হবে যে শক্তির সাহায্যে সে অন্যদের কাবু করতে পারে। ইমাম শাফেয়ী এ কথাও বলেছেন– প্রশাসক যখন দুর্বল হয়ে যায় ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা শহরের ভিতরে এসে ডাকাতি ও ভীতি ছড়ানোর মতো কারণেও তাকে মুহারিব বলা হবে। অন্যসব ব্যাপারে যেমন কেউ কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে লুট আখ্যা দেয়া হবে। মুহারাবা ডাকাতি নয়। ভারত উপমহাদেশে যে বিষয়টিকে WAGING WAR AGAINST THE KING বলে অভিহিত করা হয়।

৮. মুঈনুল হুক্কাম পৃঃ ১৮৫।

৯. আসসিয়াসাতুশ শারইয়াহ, ইবনে তাইমিয়া পৃঃ ৩৬।

১০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ : ইবনে রুশদ খণ্ড ২য় পৃঃ ২৮১-২৮১, আসসিয়াসাতুশ শারইয়াহ্ ইবনে তাইমিয়াহ পৃঃ ৩৬।

১১. বিদায়াতুল মুজতাহিদ খণ্ড ২য় পৃঃ ২৮১।

১২. বাদায়ে' ওয়াসসানায়ে : আলকাসানী খণ্ড-৭, পৃঃ ২৩-৩৪ ফতহুল কাদির খণ্ড, ৫ পৃঃ ৩০-৩১; ফতোয়া আলমগীরী খণ্ড ২য়, পৃঃ ১৪৩।

১৩. আল-আহকামুস সুলতানিয়া : আবু ইয়া'লা পৃঃ ২৪৭ প্রকাশ ১৩৫ হিঃ সহীহও হাওয়াশী শাইখ হামেদ আল মক্কী। আহকামুস্ সুলতানিয়া আল মাওয়ার্দী পৃঃ ২১২, বিদায়াতুল মুজাতাহিদ খণ্ড ২য় ৩৬২।

১৪. দেশান্তর বা বাড়িছাড়া করার হুকুমটি সেই যুগে করা হয়েছিল যখন মানুষের যাতায়াত ছিল উট কিংবা পায়ে হাঁটা অথবা ধীরগতির কোন যানবাহনের মাধ্যমে। বস্তুত 'জালা ওয়াতান' বা দেশান্তরের শাস্তি বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে নতুনভাবে নির্ধারণ করতে হবে। (অনুবাদক)।

১৫. মুঈনুল হুক্কাম পৃঃ ১৮২ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫ খণ্ড ২য়। আল-আহকামুস সুলতানিয়া আল মাওয়ার্দী পৃঃ ২১৬, আল-আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়া'লা পৃঃ ২৪৭।
১৬. মুঈনুল হুক্কামু পৃঃ ১৮২। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ইবনে রুশদ, খণ্ড ২য়, পৃঃ ২৬৪ আল আহাকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়া'লা পৃঃ ২৪৭
১৭. আল মুগনী ইবনে কুদামা খণ্ড-১০, পৃঃ ১২০-১২১, প্রকাশ- ১৩৪৮ হিজরী, মুদ্রণ- আল মানার।
১৮. আল মাবসূত আস-সারাখসি, খণ্ড-৯, পৃঃ ১৩৬।
মুঈনুল হুক্কাম, পৃঃ ১৮২, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ইবনে রুশদ ২য় খণ্ড, পৃঃ- ৩৬৩, আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া আলমাওয়ার্দী- পৃঃ ২১২। আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়ালা, পৃঃ ২৪, আলমুগনী ইবনে কুদামা খণ্ড-১ম, পৃঃ ১২০ আহকামুল কুরআন, জাসসাস্ পৃঃ ৩, ২৫৬ ও ২৫৭ নাইলুল আওতারঃ শাওকানী খণ্ড-৭, পৃঃ ১০, ২৫।
১৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদঃ ইবনে রুশদ খণ্ড-২য়, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪, আলমুগনীঃ ইবনে কুদামা খণ্ড-১০, পৃঃ ১২৪, আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবুইয়া'লা পৃঃ ২৪৭-২৪৮।

বাংলাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা ও মানবাধিকার

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

[ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার অপব্যবহার এবং এ ধারায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের রিমাণ্ডে নেয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত একটি রীট (Writ) মামলার রায়ে হাই কোর্টের একটি বেঞ্চ গত ৭ এপ্রিল, ২০০৩ তারিখে প্রদত্ত এক আদেশে সন্দেহবশত ৫৪ ধারায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ১৬৭ ধারায় রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করাকে সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করেন।

হাই কোর্ট একই আদেশে ৫৪ ধারা ও ১৬৭ ধারার ক্ষেত্রে সংশোধনী আনার জন্য সরকারকে ১৫ দফা নির্দেশনা দিয়ে ৬ মাসের মধ্যে তা কার্যকর করার আদেশ দিয়েছিলেন।

সরকার হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলে আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গত ২ আগস্ট, ২০০৩ তারিখে সরকারের 'লীভ টু আপীলে'র শুনানী শেষে সরকারকে হাইকোর্টের আদেশ কার্যকর করার জন্য পুনরায় ৬ মাস সময় দেন। এ সময়সীমার ভেতরে ধারা দু'টিতে আরও কোন ত্রুটি রয়েছে কী না- তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে।]- লেখক।

সম্প্রতি আমাদের দেশের সুধী সমাজের বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে একটি বিষয়, তা হলো- ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা। আইনজীবী, বিচারক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, অন্যান্য পেশাজীবীসহ দেশের বিবেকবান প্রতিটি নাগরিক সুশীল সমাজের প্রতিটি সদস্যকেই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে ভীষণভাবে। তাদের বিবেচনায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চম আইন (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত) ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারাটি অধুনা একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন আইনানুগ করার কালা কানুনে পরিণত হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে প্রথমেই দেখা যাক ৫৪ ধারাতে কী আছে । ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় বলা হয়-

যে কোন পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অথবা ওয়ারেন্ট ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করতে পারেন–

লেখক : প্রাবন্ধিক ও আইনবিদ।

প্রথমত কোন আমলযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি অথবা এরূপ জড়িত বলে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে;

দ্বিতীয়ত আইনসঙ্গত অজুহাত ব্যতীত যার নিকট ঘর ভাঙার কোন সরঞ্জাম রয়েছে সেরূপ ব্যক্তি (এ আইন সঙ্গত অজুহাত প্রমাণ করবার দায়িত্ব তার);

তৃতীয়ত এ কার্যবিধি অনুসারে অথবা সরকারের আদেশ দ্বারা যাকে অপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়েছে;

চতুর্থত চোরাই বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে– এরূপ মাল যার নিকট রয়েছে এবং যে এরূপ সম্পর্কে কোন অপরাধ করেছে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে;

পঞ্চমত পুলিশ অফিসারকে তার কাজে বাধাদানকারী ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি আইনসঙ্গত হেফাযত থেকে পালিয়ে গেছে অথবা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে;

ষষ্ঠত বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে পলায়নকারী বলে যাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে;

সপ্তমত, 'বাংলাদেশে করা হলে অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য হতো– বাংলাদেশের বাইরে কৃত এরূপ কোন কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি অথবা এরূপ জড়িত বলে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে অথবা বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে এবং যার জন্য সে প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত কোন আইন অথবা ১৮৮১ সালের পলাতক অপরাধী আইন অনুসারে অথবা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশে গ্রেফতার হতে অথবা হেফাজতে আটক থাকতে বাধ্য;

অষ্টমত কোন মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী যে ৫৬৫ ধারার (৩) উপধারা অনুসারে নিয়ম লঙ্ঘন করে;

নবমত যাকে গ্রেফতারের জন্য অপর কোন পুলিশ অফিসারের নিকট থেকে অনুরোধ পত্র পাওয়া গেছে; যদি যাকে গ্রেফতার করা হবে তার এবং যে অপরাধ অথবা অন্য যে কারণে গ্রেফতার করা হবে সে সম্পর্কে উক্ত পত্রে সুস্পষ্ট তথ্য থাকে এবং তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যিনি অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছেন, সেই অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে আইনসঙ্গতভাবে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারেন।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী, একজন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে প্রাপ্ত গ্রেফতারী পরোয়ানা ব্যতীত একজন আমল অযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে তার অপরাধের জন্য গ্রেফতার করতে না পারলেও অবস্থাধীনে কতিপয় ক্ষেত্রে পুলিশ আমলযোগ্য অপরাধের জন্যও অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারেন। অন্যদিকে

আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা মোতাবেক গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ এরূপ অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন।

সম্পূর্ণ ধারাটি পড়লে মনে হয় যে, পুলিশ অফিসারের হাতে এ বিধান বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। কেবল সন্দেহের বশীভূত হয়ে তারা বিনা ওয়ারেন্টে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন। তবে,
– সন্দেহটি যুক্তিসঙ্গত হতে হবে,
– সন্দেহের দৃঢ় ভিত্তি থাকতে হবে
– খামখেয়ালীভাবে সন্দেহ করে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটি ভিন্ন। পুলিশ প্রায়শ ৫৪ ধারার উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণের অপেক্ষা না করেই নাগরিকদের গ্রেফতার করে থাকেন। সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হলো, অনেক ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের কৌশল হিসেবেও পুলিশ নিরপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করতে দ্বিধা করেন না। অবলীলায় অপপ্রয়োগ ঘটানো হয় ৫৪ ধারার। মাত্র ক'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শামীম রেজা রুবেল হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করা যায়। পুলিশ ৫৪ ধারা বলে রুবেলকে গ্রেফতার, স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে নির্মম নির্যাতন এবং পরিণতিতে অল্প ক'ঘন্টার মধ্যে তার মৃত্যু হলে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তীব্রভাবে।

আসলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা শুরু হয় ৯০ দশক থেকে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এ ধারার ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা তেমন শোনা যায় নি। আবার ৫৪ ধারার ৯টি উপ-ধারার মধ্যে একটি উপধারা নিয়ে অভিযোগ মারাত্মক। আর সেটি হলো পুলিশ সন্দেহজনক মনে করে যখন তখন কাউকে বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন। গ্রেফতারের ব্যাপারে পুলিশকে প্রদত্ত ব্যাপক ও অস্বাভাবিক ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে এর অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ রোধকল্পে কতিপয় সুপারিশ–

ক. ৫৪ ধারার একটি দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। এ আইনের ব্যবহার সম্পর্কে পুলিশের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। পুলিশের জবাবদিহিতার জন্য একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় প্রতিষ্ঠা দরকার।

খ. নিছক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায়ের জন্য রিমান্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রকাশ্য বিচার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ. রিমান্ড আইনের সাথে নির্যাতন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ গ্রহণ ও আইনজীবীর উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

ঙ. ৫৪ ধারার অপব্যবহার রোধকল্পে দায়রা জজকে ক্ষমতা দিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধিতে একটি নতুন বিধান সংযোজন করতে হবে। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে দায়রা জজ সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারবেন। সরকারী পাওনা আদায় আইনের অধীনে এ ক্ষতিপূরণ আদায় করার বিধান রাখতে হবে। আদালতের এ আদেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়েরের বিধান থাকতে হবে।

চ. পুলিশ একটি প্রতিষ্ঠান। পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার দরকার। পুলিশ বিভাগে একটি স্বতন্ত্র 'প্রসিকিউশন সেল' গঠন করা প্রয়োজন।

ছ. কিছু তথ্য ডকুমেন্ট হাতে পাওয়ার পরই কেবল পুলিশ কর্তৃক কাউকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

জ. পুলিশ কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের তিন দিনের মধ্যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে ব্যর্থ হলে ম্যাজিস্ট্রেট কথিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দানের আদেশ দিতে পারবেন। এ মর্মে ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

পরিশেষে বলবো, কোন আগ্রাসী নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র কারও প্রত্যাশিত নয়। আমাদের সংবিধানও আমাদেরকে একটি নিরাপদ মুক্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সর্বোপরি আজ আমাদের সবার প্রত্যাশা এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণগণতন্ত্রায়ণ। এখন আমরা কেবল ভোটের মাধ্যমে সরকার বদলের অধিকারই চাই না, চাই পরিপূর্ণ মানবাধিকার। চলার স্বাধীনতা, বলার স্বাধীনতা এবং চাই পূর্ণ নিরাপত্তা। এ নিরাপত্তা দেবে রাষ্ট্র, দেবে সরকার। রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ নিরাপত্তার প্রশ্নে ভয়ঙ্কর আগ্রাসী হয়ে উঠলে তা হবে সমগ্র জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যের তিলক, মানবতার জন্য নিদারুণ কলঙ্ক এবং নির্লজ্জ ও গ্লানিকর। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতেও একথারই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে,

ধারা-৫ : কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা কিংবা কাউকে নির্যাতন করা বা শাস্তিভোগ করতে বাধ্য করা চলবে না।

ধারা-৯ : কাউকে খেয়াল খুশী মতো গ্রেফতার বা আটক করা অথবা নির্বাসন দেয়া যাবে না।

কেবল মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতেই নয়, ১৯৯০ সালের ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মানবাধিকার সম্পর্কিত কায়রো ঘোষণা (Cairo Declaration) তেও অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে।

ধারা-২০: বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত (Restrict) করা বা কেড়ে নেয়া, তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অনুমোদিত নয়। কাউকে কোন প্রকার দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন করা বা তার মানহানি করা এবং তার প্রতি কোনো প্রকার নিষ্ঠুরতা বা তাকে কোনোরকম অমর্যাদা (indignity) করা যাবে না। অথবা কোনো ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া বা তার স্বাস্থ্য বা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোনো ডাক্তারি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষায় (Experiment) তাকে ব্যবহার করা যাবে না। অথবা এমন কোন জরুরী আইন ঘোষণা করা যাবে না, যাতে এ ধরনের কাজে কেউ বিশেষ কর্তৃত্ব পেতে পারে।

আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

হিজরী প্রথম বর্ষ থেকেই মুসলমানরা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। প্রায় বারো'শ, তেরো'শ বছর পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা চলে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে যে কোনো ভাবেই হোক ইসলামী আইনেরই প্রচলন ছিল। বিগত শতকের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষে তুর্কী খিলাফতের অবসান হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছিল ইসলামী আইনের প্রচলন।

এরপর পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসন এবং মুসলমানদের পাশ্চাত্য চিন্তায় দীক্ষা নেবার পর থেকে মুসলমানরা এবং মুসলিম প্রভাববলয়ভুক্ত বিপুল সংখ্যক অমুসলিমরা ইসলামী আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত।

অর্থাৎ দেড় দু'শ বছর আগেও বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রচলন ছিল।

মুসলিম পার্সোনাল 'ল' নামে বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী আইনের একটা ক্ষুদ্রাংশের প্রচলন এখনো আছে। এটা আসলে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসনের ফল। মুসলমানদের আইন কানুনের এতটুকুই তারা বরদাশত করেছিলেন মাত্র। তাই পরম দয়া পরবশ হয়ে এটুকুই বাকি রেখেছিলেন। তা ছাড়া এই ব্যক্তিগত আইনটুকুও পরিবর্তন করে সরাসরি মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করার ঝুঁকি গ্রহণ করতে মনে হয় তারা সাহস করেন নি।

উপনিবেশিক শাসন আমাদের আইনগত কাঠামোকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। তার জায়গায় তারা এনেছে ব্রিটিশ 'ল' তথা প্রাচীন রোমান 'ল'এর নতুন সংস্করণ। তবে আজ থেকে চৌদ্দ 'শ' বছর আগে ইসলাম আইনের যে ভিত রচনা করেছিল তা এতই মজবুত ও বাস্তবসম্মত ছিল যে, বিশ্বমানবতার হাজার বছরেরও বেশি সময় এই আইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। হাজার বছরের সকল রকম পরিবর্তনের গ্রহণযোগ্যতা এই আইনের মধ্যে ছিল। রোমান 'ল' ও ব্রিটিশ 'ল' এই আইন থেকে তাদের অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। বরং কোথাও তো মনে হবে একদম হুবহু নকল করেছে। এ জন্য বিগত দেড় দু'শ বছরে মুসলমান দেশগুলোয় ব্রিটিশ 'ল' ও রোমান 'ল'-এর অবাধ শাসন ও প্রতিপত্তির পরও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আইনের গ্রহণযোগ্যতা কোনো না কোনো পর্যায়ে এখনো রয়ে গেছে।

লেখক : জেনারেল সেক্রেটারী, ইসলামিক 'ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ ও সিনিয়র এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ।

কিন্তু আজকে মুসলমানদের সমস্যা ভিন্নতর। বিগত দু-আড়াই'শ বছর থেকে মুসলমানরা ইসলামের মূলনীতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বলতে গেলে সারাবিশ্ব এখন একটা অভিনব আধুনিক সমাজ, পরিবেশ ও ব্যক্তি জীবন গঠনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমানরাও ইসলামের অনেক মূলনীতিকে বাদ দিয়ে এবং এড়িয়ে আধুনিক বিশ্বের নীতি গ্রহণ করেছে।

আধুনিকতা এখন একটা জীবন পদ্ধতির রূপ নিয়েছে। এই আধুনিকতাটা কি ? আধুনিকতা একটা উন্নত, নিরাপদ ও পরিকল্পিত জীবন যাপনের আভাস দেয়। বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার উন্নয়নের সাথেই আধুনিকতা সম্পর্কিত। কোনো বিশিষ্ট চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে এর সম্পর্ক না থাকলেও প্রধানত যে গ্রাউন্ড ও ময়দান থেকে এর আমদানি হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহে বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বাসহীনতা থাকার কারণে কেউ কেউ বিশ্বাসহীনতাকে এর অংগে পরিণত করতে চান। কিন্তু মুসলমানদের সতর্ক দৃষ্টি এবং বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

মূলত ইসলামের মধ্যেও আধুনিকতা রয়েছে। বরং প্রকৃত অর্থে ইসলাম চির আধুনিক। আধুনিকের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জাদীদ'। এই জাদীদ শব্দ ইসলামের আগমনের প্রথম দিন থেকেই প্রচলিত আছে। এই জাদীদ এসেছে 'তাজদীদ' থেকে। তাজদিদ অর্থ কোনো জিনিসকে অভিনব ও নতুন রূপ দেয়া। যারা এই রূপ দেন তাদেরকে বলা হয় মুজাদ্দিদ। এই তাজদীদের পাশাপাশি আর একটা শব্দ আছে 'তাজদ্দুদ'। তাজাদ্দুদ অর্থ হচ্ছে, একটা জিনিসের নতুন রূপায়নের সময় তার প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা, যার ফলে জিনিসটা আসল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা যায়, ইসলামে তাজদীদ আছে, তাজাদ্দুদ নেই। অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যুগে যুগে আধুনিক শেপ নেবে কিন্তু তার বাহ্যিক চেহারায় পার্থক্য সূচিত হলেও প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে কোনো ফারাক দেখা দেবে না। ইসলাম ও পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা আধুনিকতার মধ্যে তফাত এখানেই। তাই বিজ্ঞান ও কারিগরি উৎকর্ষতাকে আত্মস্থ করে নিয়ে ইসলামী আধুনিকতা তার নিজস্ব পথে এগিয়ে চলে।

আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইনের প্রচলনকে আমাদের এই দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে।

আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের সমস্যা

১. আধুনিক মুসলিম সমাজগুলো ক্রম বিকাশমান। পাশ্চাত্য চিন্তা, ভাবধারা, এবং পাশ্চাত্যজীবন ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে সর্বোপরি তাদের আধিপত্যবাদের প্রভাবে মুসলমানদের জীবনে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। গত এক দেড় শ বছর থেকে আমরা পাশ্চাত্যের আইন দ্বারা শাসিত হচ্ছি। ফলে আমাদের যে সমস্ত আইন

ছিল যথা ফৌজদারী, সাক্ষ্য, চুক্তি, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় আইনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ল ই প্রবর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের আইনগুলোর প্রয়োগ না থাকার কারণে পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সেগুলোর মধ্যে অনেক সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ জন্য ইসলামী শরীয়া আইনের মূলনীতির ভিত্তিতে যথাযথ গবেষণা প্রয়োজন।

২. ইসলামী আইন সম্পর্কে মুসলমানদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে এই আইন সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা এই ধরনের কিছু অপরাধ দণ্ডবিধিকে কেবল ইসলামী আইন মনে করা হয়। অথচ ইসলামী আইন জীবনের সমস্ত বিভাগ ও ক্ষেত্রের সাথে জড়িত এবং সব ক্ষেত্রেই ন্যায় ও ইনসাফ এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই তার মূলনীতি। কাজেই এই ধরনের বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

৩. আইনের সাফল্যের সাথে বিচার পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে ইসলাম উন্নত পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং প্রশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখেছিল। বিচারকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোন অন্তরায় রাখে নি। কাজী অর্থাৎ বিচারপতির সমন পেয়ে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিত্বকে সরাসরি আদালতে হাজির হতে হতো। তিনি কাজীর সামনে চেয়ারে বসতে পারতেন না, আসামীর কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতে হতো। কাজীর বিচারকে মাথা পেতে মেনে নিতে হতো, কাজীর রায় তার বিরুদ্ধে হলেও। এই ছিল ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রাণ শক্তি। অথচ এই কাজী প্রথা নিয়ে এই বিচারক কাজীকে ব্রিটিশ আমলের বিয়ের কাজীর সাথে একাকার করে ইসলামের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ান হচ্ছে।

৪. খোদ ওলামায়ে কেরামের একটি অংশের মধ্যেও ইসলামী আইন সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি আছে। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট তথা আইন প্রণয়ন পরিষদ আইন প্রণয়ন করবে। তবে এ আইন চূড়ান্ত নয়। এ পার্লামেন্টের ওপর থাকবে বিশেষজ্ঞ ওলামা বোর্ড এবং বোর্ডের অনুমোদনেই আইন চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। কাজেই ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা ছাড়া দেশে কোন ইসলামী আইন প্রণীত হবে না।

৫. পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলামের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় ওলামায়ে কেরামের কোন ভূমিকা না থাকার কারণে পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে উপরউক্ত ধারণাই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ অবস্থায় ইসলামী আইন প্রবর্তন একটি দুরূহ কাজ।

৬. মুসলিম দেশের শাসকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি রাজনীতি দ্বারা মহামারী রোগের ন্যায় আক্রান্ত। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই ইসলামের আইন-কানুনের নাম শুনলেই ভয়ে তাদের বুক কেঁপে ওঠে ।

৭. আধুনিক বিশ্বে ভোগবাদী মনোভাব এমন পর্যায় পৌছেছে যেখানে সমস্ত প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটনকারী আইনের প্রবর্তন অচিন্তনীয়।

৮. আইন হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ বা অনুমোদনপ্রাপ্ত বিধি বিধান। মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের অনুগত রাষ্ট্রীয় শাসন না থাকা অবস্থায় ইসলামী আইন প্রবর্তন কঠিন হয়ে পড়েছে।

৯. আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন প্রবর্তনের পক্ষে আইনজীবিরাও একটি বড় বাধা। বৃটিশ আইনের ওপর পড়াশোনা ও চর্চা এবং আদালতে এই আইনের সমর্থনে নিজেদের বুদ্ধি ও যুক্তির ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে তাঁরা, সে কারণে তারা মানসিকভাবে এর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন, অন্যদিকে ইসলামী আইন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার বা প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞান থাকার ফলে তাকে তারা ব্যর্থ ও অকিঞ্চিত মনে করেন।

সম্ভাবনা

১. দেশের বর্তমান প্রচলিত আইনের উপস্থিতিতে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, হত্যা ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্যকলাপ উত্তর উত্তর বৃদ্ধির মুখে। শুধু এই নয়, এই আইন সর্বক্ষেত্রে বিরোধ বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে চলছে, যার ফলে চতুরদিকে হতাশা। বিপরীত পক্ষে ইসলামী আইন এগুলো খতম করার দাবীদার। ফলে ইসলামী আইনের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা উত্তর উত্তর বেড়ে যাচ্ছে।

২. ইসলামী আইনের এটাও একটি প্লাস পয়েন্ট যে, দীর্ঘকাল অর্থাৎ হাজার বছর সারা বিশ্ব ইসলামী আইনদ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে।

৩. আজকের গণতান্ত্রিক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের মধ্যে সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফ। এগুলো বাস্তবায়ন একমাত্র ইসলামী আইনেই সম্ভব।

৪. ইসলাম সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে অমুসলিমরাও অনেক সজাগ হয়েছে, তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিপুল সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহন করছে।

৫. আজকের বিশ্বে দিকে দিকে মুসলমানদের জাগরণ ও ইসলামী আইনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করার আকাংখা বেড়ে চলছে। এই আকাংখা চরিতার্থ করার জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত হচ্ছে। এগুলো সবই ইসলামী আইনকে বর্তমান বিশ্বের জন্য বিপুল সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

আইনের দৃষ্টিতে বীমা

ড. হোসাইন হামেদ হাস্‌সান

আইনের দৃষ্টিতে বীমা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যাতে করে বীমা সম্পর্কে শরীয়তের বিধানাবলী নির্ধারণ করা সহজ হয়। বীমা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানার বিষয়টি বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে জরুরী হয়ে পড়েছে। কেন না আমাদের সমাজে ইতোমধ্যে বীমা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সেই সাথে বীমাকে আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধও করা হয়েছে। কোন গবেষক যদি বীমা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি হবে তা জানতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই বীমা সম্পর্কে প্রচলিত আইনের বিধানাবলী জ্ঞাত হতে হবে, যে বিধানের আওতায় বীমাকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। সেই সাথে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলনীতি কিসের ভিত্তিতে রচিত এ সম্পর্কেও তাকে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। এর পাশাপাশি জানতে হবে বীমা কোম্পানীগুলো কিভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষক যদি উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগতি লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করেন, তাহলে তাকে একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, বাস্তবে বীমার কোন অস্তিত্ব সমাজে বা দুনিয়াতে নেই। বীমা ব্যবসার সাথে জড়িত অনেকেই বীমার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হোঁচট খেয়েছেন। তারা বীমার বাস্তব অবস্থা দেখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বীমা কোম্পানিগুলো যে বীমা করে থাকে তা এমন একটি সহযোগিতামূলক চুক্তিতে উপনীত হওয়াকে বুঝায় যা বহুকষ্টের বিনিময়ে সংগঠিত হয়েছে। আর বীমার সাথে অসংখ্য এমন লোক জড়িত রয়েছে যাদের প্রত্যেকেই ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত। ঝুঁকি হলো, কিস্তি আকারে বীমা কোম্পানীকে বীমাকারী যে প্রিমিয়াম একটি বিধিবদ্ধ নিয়মে আদায় করে এই প্রিমিয়ামের অর্থ সেই সম্পদের পর্যায়ে পড়ে যে সম্পদকে অন্যের অধিকারে ইচ্ছামাফিক খরচ করার জন্যে দিয়ে দেয়া হয়। বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাকারীকে যে প্রতিদান দেয় সেই প্রতিদান হলো কিস্তির বিনিময়। যে কিস্তি বীমাকারী অর্থ হিসেবে আদায় করে থাকে। বীমা কোম্পানীর প্রদেয় অর্থ বীমাকারী তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে পেয়ে থাকে। এ প্রতিদান বীমাকারী পেয়ে থাকে বীমা প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বীমা সংক্রান্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে। কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার কারণে তাকে এ প্রতিদান দেয়া হয়। বীমা কোম্পানীর সাথে বীমাকারীর যে চুক্তি হয় এ চুক্তিকে বীমা চুক্তির পাশাপাশি মোদারাবা চুক্তিও বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বীমাকারী কোম্পানীকে প্রিমিয়াম হিসেবে যে কিস্তি পরিশোধ করে এটিকে মালে মুদারাবা বলা যায়। কোম্পানী এ কিস্তির মালিক হয় না, কিস্তির টাকা দিয়ে কোম্পানী ব্যবসা করে এ ব্যবসা দ্বারা কোম্পানী যা লাভ করে এই লাভের মধ্যে কোম্পানী ও বীমাকারী উভয়েই শরীক।

লেখক : জন্ম সূত্রে মিশরীয়। ইসলামী আইন বিষয়ক কয়েকটি বিশ্বনন্দিত গ্রন্থের লেখক।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বীমাকারীর মৃত্যু না ঘটে তখন বীমা কোম্পানী ভ়ীমাকারীকে যে অর্থ ফেরত দেয় তা আসলে মুদারাবার মূলধন। এ মূলধনের সাথে লাভের মিশ্রন ঘটে। শরীয়তের মধ্যে এমন কোন বিধান নেই যে, মুদারাবার মধ্যে মূলধনের ভিত্তিতে লাভের অংশ নির্ধারিত হবে। আসলে এ ধরনের বিষয়গুলো হলো অনুমান নির্ভর যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জিনিসের কোন ভিত্তি নেই, শরীয়ত সেটিকে অস্তিত্বহীন বলেই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। অথচ বীমা একটি বাস্তবতা, এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তা যে কোন মুসলমানের জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারটি অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছেন।

বীমা সংক্রান্ত আলোচনাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে চাই। প্রথমাংশে আমরা বীমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং শেষাংশে বীমার গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রশাখা গুলোর ব্যাপারে কথা বলবো।

প্রথম অধ্যায়: বীমার সংগা উদ্দেশ্য ও প্রচলন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আইনগত বৈধতা পাওয়ার কারণে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা এবং তার লক্ষ্য ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বৈপরীত্য দৃশ্যমান। এজন্য আলোচনার শুরুতেই আমি বীমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটিকে গ্রহণযোগ্য সূত্রের দ্বারা পরিচিত করতে চাই। এর পর বীমা ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জন ও উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতাকে বাস্তবরূপ দানের জন্যে এ ব্যবসার আইনগত দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাবো।

বীমার পদ্ধতি

আইন বিশারদগণ বীমার উদ্দেশ্য ও বীমা ব্যবসার মধ্যে একটি পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন। তন্মধ্যে কারো মতে (১) বীমা এমন একটি পদ্ধতিকে বলা হয়, যে পদ্ধতি অনেক পরিশ্রম করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। বীমা এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রযুক্ত হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকেই প্রায় একই ধরনের আশংকায় নিপতিত। এই আশংকা যদি এতো লোকের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বেলায়ও বাস্তবে ঘটে যায়, তাহলে অন্যেরা দুর্গত কিংবা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে তাকে সহযোগিতা করে। সামান্য সহযোগিতার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে মারাত্মক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। তাই বলা যায়, বীমা ভালো কাজে সহযোগিতার একটি আদর্শিক নমুনা। বীমার দ্বারা একে অপরকে সহযোগিতা করে বিপদগ্রস্ত লোকজনকে সমূহ বিপদ ও আশংকা থেকে পরিত্রাণ দেয়া যায়।

উস্তাদ শাইখ আলী আল খরীফ বীমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি হিসেবে এর সংগায় বলেন, বীমা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক এমন একটি চুক্তিতে অংশ গ্রহণের নাম যা বহুসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে রূপলাভ করে; যাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন বিপদের মুখোমুখি। তারা প্রত্যেকেই এ চুক্তিতে উপনীত হয় যে, তাদের মধ্যে কেউ যদি বিপদে নিপতিত হয় তাহলে তারা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করে

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্ভোগ লাঘবে সহযোগিতা করবে। এর দ্বারা যারা বিপদে নিপতিত হয় তারা বড় ধরনের নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

প্রফেসর মোস্তফা আহমদ আয-যারকা বীমা পদ্ধতি উপস্থাপন করে বলেন, "বীমা পদ্ধতি সম্পর্কে যে ধারণা আইনজ্ঞদের রয়েছে, তা হলো বীমা একটি সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষামূলক পদ্ধতি যা আশংকা ও বিপদ গুলোকে টুকরো টুকরো করে সকল বীমাকারীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ক্ষয়ক্ষতির বিকেন্দ্রিকরণের একাজটি হয়ে থাকে একটি প্রতিদানের বিনিময়ে। যে প্রতিদান বীমাকারী ব্যক্তি কিস্তির মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করে। ক্ষয়ক্ষতির বোঝাটি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ঘাড়ে পড়ে না।"

বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তিরা বলেন, 'ইসলাম সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটাই প্রত্যাশা করে যে, সমাজ এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করুক যে ক্ষেত্রে প্রত্যেকের প্রাপ্তি ও অধিকারে সমতা থাকবে, থাকবে পারস্পরিক সহযোগিতা আস্থা ও নির্ভরশীলতা।'

বীমা তার পদ্ধতিগত ও প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনার এমন একটি কাজ যা শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সামনে আমরা এ ব্যাপারটির আরো ব্যাখ্যা করবো। শরীয়তের প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদিও বীমা ব্যবস্থাপনার চাহিদাকে সমর্থন করে। কারণ বীমা বলে এমন একটি সহযোগিতামূলক চুক্তিকে যা বহুলোকের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। আর এ সহযোগিতার উদ্দেশ্য হলো বিপুল সংখ্যক বীমাকারীর মধ্যে বিপদে পতিত লোকদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা অথবা তাদেরকে বিপদ মুক্ত রাখা। আর তাদের সহযোগিতার মাধ্যম এক্ষেত্রে সেই সামান্য ত্যাগ যা তাদের প্রত্যেকেই কিস্তি হিসেবে আদায় করে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে বীমার অর্থ যদি এমনটি মনে করা হয় তাহলে আর শরীয়তের দৃষ্টিতে এটির বৈধতার ব্যাপারে কোন ধরনের মত পার্থক্য থাকে না। মতবিরোধ ও মতপার্থক্য শুধু বীমার পদ্ধতিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে থাকতে পারে। গবেষকদের কথা হলো, বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে তা প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে। কাজেই জরুরী হলো, এ ব্যবস্থা এমন কোন প্রতিষ্ঠান করতে পারবে যে প্রতিষ্ঠান কোন লাভের প্রত্যাশা করবে না। সেটিও বীমা হতে পারে যখন এ ধরনের কার্যক্রম সরকার কিংবা সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে, যে ভাবে ত্রান সংস্থাগুলো সহযোগিতা ভিত্তিক পারস্পরিক বীমা করে থাকে।

ইসলাম পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে যে সব বিষয়কে বৈধ ঘোষনা করেছে এগুলো হলো, উপহার, উপঢৌকন, দান, অনুদান, সদকা, খয়রাত, ইত্যাদি। এ গুলোর মধ্যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করে এবং তারা এ সম্পদ বিসর্জনের দ্বারা কোন ধরনের আর্থিক প্রতিদান আশা করে না। এজন্যেই কোন কোন আলেমের দৃষ্টিতে এসব বীমা বৈধ যদিও এর মধ্যে অজ্ঞতা কিংবা প্রতারণার অবকাশ রয়েছে। কারণ যে ব্যক্তিকে উল্লেখিত কাজের মাধ্যমে সাহায্য করা হবে, এই দান অনুদানের দ্বারা তার কল্যাণের বিষয়টি তিরোহিত হওয়ার আশংকা থাকে না। পক্ষান্তরে প্রত্যাশিত প্রতিদান প্রাপ্তির বেলায় যদি উভয় পক্ষ থেকে কোন পক্ষের

অজ্ঞতা কিংবা প্রতারণার কারণে ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে অপর পক্ষেরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম কাররানী র. চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আর্থিক কর্ম সম্পাদনের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তন্মধ্যে দুটির অবস্থা খুব পরিষ্কার। এ দুটিতে কোন অস্পষ্টতা নেই। আর তৃতীয়টি হলো এ দুটির ব্যতিক্রম। এটি পূর্বোক্ত দুটির মাঝামাঝি অর্থাৎ এতে অস্পষ্টতাও রয়েছে। স্পষ্ট দুটোর মধ্যে একটি আর্থিক কর্ম হলো নির্ভেজাল বিনিময়ের লেনদেন। বিনিময় মূলক লেনদেনের মধ্যে সব ধরণের অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা মুক্ত হতে হবে। আর স্বচ্ছ অপর আর্থিক লেনদেনটি হলো কাউকে উপকার করা, অনুদান বা দান করা, যার মধ্যে সম্পদে কিংবা মূলধনে বৃদ্ধির কোন প্রত্যাশা থাকে না। যেমন দান, অনুদান, সদকা, কিংবা হাওলাত, কর্জ ইত্যাদি। কারণ এ গুলো হলো এমন আর্থিক কার্যক্রম যেগুলোতে লাভলোকসানের কোন প্রত্যাশা থাকে না। যার প্রতি অনুগ্রহ করা হলো, দান অনুদান কিংবা কর্জদানের দ্বারা যদি তার কোন উপকার নাও হয়, তার কোন ক্ষতিও হয় না। কারণ সে তো কোন টাকা খরচ করেনি। কিন্তু প্রথমোক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রটি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ ওখানে যদি কোন ধরনের অজ্ঞতা কিংবা অস্পষ্টতা থাকে তাহলে একজনের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। শরীয়ত এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দূর করতে নির্দেশ দিয়েছে। অনুদানের ক্ষেত্রে যেহেতু কারো ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না তাই শরীয়ত এ ক্ষেত্রে বাধাহীন। অনুদান ও অনুগ্রহের সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত উদারতাকে উৎসাহিত করে। সেই সম্পর্কে সে জ্ঞাত থাকুক বা অজ্ঞাত থাকুক। কেন না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা সংঘটিত হওয়ার কারণে তার ওপর আমল করা সহজ হয়। পক্ষান্তরে এটি মেনে নেয়া নিষেধ থাকলে দান, খয়রাত, ও উদারতায় বিঘ্ন ঘটে। এজন্য কারো যদি কোন উট হারিয়ে যায় সেটি অন্য কাউকে দান করে দেয়া জায়েয। কারণ যাকে দান করা হয়েছে যদি হারানো উটটি সে খুঁজে পায় সে তা দিয়ে উপকৃত হতে পারবে। আর যদি খুঁজে সেটিকে বের করতে নাও পারে তবুও তার কোন ক্ষতি নেই। কারণ হারানো উটের মধ্যে তার কোন ব্যয় নেই। বস্তুত ইমাম মালেক তাই বলেছেন, তা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর তৃতীয় বিষয়টি হলো পারস্পরিক সহযোগিতার বিনিময়ে দু'জনের সম্মিলন, সেটি হলো বিবাহ।

প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলো বীমাকারীদের সাথে যে বীমা ব্যবসা করে তাতে সহযোগিতা ও বীমাকারীর উপকার করার উদ্দেশ্য থাকে না। বীমা কোম্পানীর উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা করা। তাই ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে বীমা একটি বিনিময়যোগ্য ব্যবসা; এটি কোন মতেই কল্যাণমূলক কাজ নয়। বীমা কোম্পানীর সাথে বীমাকারীদের যে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলা হয়, বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব বীমা ব্যবসার মধ্যে দেখা যায় না। কারণ বীমা ব্যবস্থাপনায় এমন কোন ধারার সংযোজন নেই যা দ্বারা বীমাকারী ও কোম্পানীর মধ্যে সহযোগিতা মূলক ব্যাপারটিকে স্বীকৃতি দেয়া যায়। অবশ্য বাস্তবে যদি এ ধরনের সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান কিংবা দল পাওয়া যেতো যাদের মধ্যে এবং বীমা কোম্পানীর মধ্যে এ ধরনের সহযোগিতার লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কি তা জানার জন্যে সচেষ্ট হতাম।

অনুরূপ বীমা কোম্পানীর সাথে বীমাকারীরা যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সেই চুক্তিতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার মাধ্যমে বীমাকারীর প্রতারণা থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কেন না কোম্পানীর সাথে বীমাকারীদের সাহায্য সহযোগিতামূলক কোন চুক্তি থাকে না যে, কোম্পানী এর বিনিময়ে সহযোগিতাকে বাস্তবে রূপ দেবে। সহযোগিতার ব্যাপারটি বীমা ব্যবসার মধ্যে নিতান্তই একটি ধারনা, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। সেই সাথে বীমা ব্যবসার নীতি-বিধানেও সহযোগিতার পক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবে বীমা কোম্পানী ও বীমাকারীর মধ্যে যে লেনদেন হয়ে থাকে তাতে এক পক্ষে থাকে কোম্পানী আর অপর পক্ষ হয় বীমাকারী। বীমা কোম্পানী ও বীমাকারীর মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে যে চুক্তি হয় সেই চুক্তিতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে, কিছু দায়িত্ব উভয় পক্ষের ঘাড়ে বর্তায়; এই কর্তব্য ও দায়িত্বের ব্যাপারটিই বীমার মূল বিষয়। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ধারণাপ্রসূত বিষয়ের ব্যাপারে যখন শরীয়তের বিধান প্রয়োগের প্রশ্ন আসে তখন গবেষকরা তা এড়িয়ে গিয়ে থাকেন। ধারনাকে কেন্দ্র করে শরীয়তের কোন বিধান কার্যকর করার অবকাশ নেই।

কোন কোন গবেষক সহযোগিতার কথা বলেন। তাদের বক্তব্য হলো, বহুলোকের সমন্বয়ে বিরাট একটি সহযোগিতার ক্ষেত্র বীমা, যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে শরীকদের বিপদাপদে সহযোগিতা করা আর সেই সহযোগিতার উপকরণ হলো বীমাকারীদের সামান্য ত্যাগ। এই ত্যাগ তারা স্বীকার করে তাদের জমাকৃত প্রিমিয়াম থেকে। কিন্তু এ ধরনের সহযোগিতার বিষয়টি দুনিয়াতে প্রচলিত নয়। সেই সাথে যে সব বীমা কোম্পানী বাণিজ্যিক অংশিদারিত্বের মাধ্যমে বীমা ব্যবসা করে, তাতে এ ধরনের সহযোগিতার কোন অস্তিত্ব নেই। এ ধরনের সহযোগিতার কোন অস্তিত্ব যদি সমাজে থাকতো তাহলে সেটি শরীয়তের মূল চেতনার সাথে নিসন্দেহে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতো। শরীয়তও সেটিকে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দিতো।

বিনিময়যোগ্য বীমা পলিসিতে এ ধরনের সহযোগিতার ব্যাপারটি পাওয়া যায়। ওইসব বীমা কোম্পানী পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা প্রত্যেকটি বীমা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা পরিচালনা করে। বিনিময়যোগ্য বীমার মধ্যে কেউ বিনিময় লাভ করে না এবং কারো কাছ থেকে কেউ নিরাপত্তা ক্রয় করে না, প্রতিরক্ষা প্রত্যাশা করে না। সেখানে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ত্যাগ স্বীকার করার জন্যেই ঐক্যবদ্ধ হয়। এ ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার নিতে পারে। যেমন শ্রমিকদের সামষ্টিক বীমা করার ব্যাপারটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন সংস্থার দায়িত্বে থাকে। শ্রমিকদের বীমা করার উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর মুনাফায় অংশীদার হওয়া নয় বরং নিজেদের দুর্ঘটনাজনিত বিপদে আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করাই হয় এর উদ্দেশ্য।

অনুবাদ– আবু জামিল

ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা পদ্ধতি : সমস্যা ও প্রতিকার

আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

মুরাবাহা আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পারস্পরিক উপকার করা, ফায়দা দেয়া, লাভবান হওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কোন পণ্য বা বস্তু ক্রয় করার পর তা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভে পুনরায় বিক্রি করাকে মুরাবাহা বলা হয়। ইংরেজিতে এই পদ্ধতির ক্রয় বিক্রয়কে বলা হয় Contact sale on profit অর্থাৎ চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রি করা।

মুরাবাহার পদ্ধতি হলো, বিক্রেতা পণ্যের মূল্য উল্লেখ করে কি পরিমাণ লাভে সে বিক্রি করবে ক্রেতাকে তা অবহিত করবে। ক্রেতা বিক্রেতার প্রস্তাবে সম্মত হলে ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে বিক্রির কাজ সমাধা করবে। মুরাবাহা দুই ধরনের হতে পারে। নগদ মূল্যে বিক্রি কিংবা বাকীতে বিক্রি। পণ্য মূল্যের উপর সুনির্দিষ্ট লাভের পরিমাণ উল্লেখ করে মুরাবাহা পদ্ধতিতে ব্যবসা ইসলামী শরীয়তে জায়েয। রসূল স. নিজে মুরাবাহা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও, তাঁদের পরবর্তী যুগেও এর প্রচলন ছিল।[১]

মুরাবাহা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, বিক্রেতাকে পণ্যের প্রকৃত মূল্য উল্লেখ করে এরপর পণ্যের সাথে যুক্ত অন্যান্য খরচ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন পরিবহন খরচ, ট্যাক্স, ভ্যাট, গুদাম ভাড়া, মজুরী ইত্যাকার আনুসঙ্গিক ব্যয় মূল মূল্যের সাথে এক করে উল্লেখ করা যাবে না। যেমন মাসউদ সাহেব দশটি গাড়ি ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লাখ) টাকা দিয়ে কিনেছেন। এরপর এগুলো জাহাজ থেকে নামানো এবং নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত নিয়ে আসতে ট্যাক্স, পরিবহনসহ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে আরো ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লাখ) টাকা। তিনি (বিক্রেতা) বলবেন, এই গাড়িগুলোর ক্রয়মূল্য পঞ্চাশ লাখ টাকা এবং অন্যান্য খরচ হয়েছে আরো পাঁচ লাখ টাকা। আর আমাকে লাভ দিতে হবে দশ লাখ টাকা। মোট ৬৫,০০,০০০/- (পঁয়ষট্টি লাখ) টাকা দিলে আমি দশটি গাড়ি বিক্রি করবো। এভাবে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে ক্রয়মূল্য এবং আনুসঙ্গিক খরচ ও লাভের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে। এতে কোন ধরনের অস্পষ্টতা রাখা যাবে না।

অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি পণ্য কোনো কোম্পানীর কাছ থেকে Whole Saller হিসেবে ক্রয় করে এবং ক্রয় মূল্যে প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে কমিশন, ডিসকাউন্ট, কনসেশন তথা কোন প্রকার মূল্য ছাড় পায়; মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রির সময় ক্রেতার কাছে

লেখক : রিসার্চ অফিসার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

বিক্রেতাকে অবশ্যই তা উল্লেখ করতে হবে। যেমন– মোবারক সাহেব জিইসি কোম্পানীর কাছ থেকে ৫০টি সিলিং ফ্যান কিনেছেন ৬০ হাজার টাকায়। কোম্পানীর কাছ থেকে এ জন্যে ৫০টি সিলিং ফ্যানে কমিশন পেয়েছেন ১০ হাজার টাকা। এখন হাসান সাহেবের কাছে মোবারক সাহেব এগুলো মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে চাইলে তাকে বলতে হবে এগুলোর ক্রয় মূল্য ৬০ হাজার টাকা কিন্তু আমি মূল্য ছাড় পেয়েছি ১০ হাজার টাকা। আপনার কাছে বিক্রি করবো ৮০ হাজার টাকায়। এতে হাসান সাহেব যদি সম্মত হন তাহলে ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয়ে নগদ বাকী উভয়টি জায়েয। আমাদের সমাজে প্রচলিত 'একদর' কিংবা পণ্যের গায়ে মূল্য নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় যদি উল্লেখিত উপাদান তিনটি যুক্ত থাকে তবে এগুলোকে মুরাবাহা হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। যেমন পণ্যের গায়ে উল্লেখ থাকবে প্রকৃত ক্রয়মূল্য, আনুসঙ্গিক খরচ এবং লাভের পরিমাণ। অবশ্য আমাদের দেশে কিছু কিছু ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্যের গায়ে মূল্য উল্লেখ থাকলেও তাতে ক্রয়মূল্য, আনুসঙ্গিক ব্যয় এবং বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কখনোই ক্রেতাকে জানানো হয় না। বস্তুত এসব ব্যবসায়ে সততা ও স্বচ্ছতা নেই বলে এগুলোকে মুরাবাহা বলে অভিহিত করার সুযোগ নেই। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যবসার গোটা প্রক্রিয়াটিই সততা ও স্বচ্ছতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান যুগে আক্ষরিক অর্থেই যারা ব্যবসায়ী তাদের মধ্যে ব্যবসা সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন ব্যাংক, অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী ব্যক্তি সংস্থা নানা ক্ষেত্রে ব্যবসা ও পুঁজি বিনিয়োগ করে। যারা সূদ ভিত্তিক ব্যবসা করে তাদের ক্ষেত্রে মুরাবাহা পদ্ধতি প্রয়োগের কোনই অবকাশ নেই। যারা সূদ পরিহার করে সূদবিহীন ইসলামী ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে আগ্রহী তারাই মূলত আমাদের এই আলোচনার লক্ষ্য।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে প্রচলিত ক্রয় বিক্রয়কে ইসলামীকরণে পদ্ধতিগত কিছু স্বচ্ছতা ও তথ্য জ্ঞাতকরণ ছাড়া আর তেমন কোনো অসুবিধা নেই। বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে জ্ঞাতকরণে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে প্রচলিত ক্রয় বিক্রয়ের বিরাট অংশকে মুরাবাহা পদ্ধতিতে জায়েয পর্যায়ে এনে ইসলামী শরীয়ত সম্মত করা যায়। অর্থব্যবস্থা ইসলামীকরণে যেসব অর্থ বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট তারা একটু যত্নবান হলেই (ফিক্সড প্রাইজ) এক দরের ক্রয় বিক্রয়কে মুরাবাহা পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব।

এখন আমরা আলোচনা করব বাকীতে ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কিত মুরাবাহা পদ্ধতি সম্পর্কে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মুরাবাহা অর্থ পারস্পরিক সহযোগীতা করা, লাভ করা, ফায়দা দেয়া। লাভ বা ফায়দার ব্যাপারটি বাকীতে আরো বেশি কার্যকর। আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো সমাজের চাহিদা পূরণে বাকী বিক্রির মাধ্যমে মুরাবাহা পদ্ধতিতে লেনদেন করে। বলা চলে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ ব্যবস্থায় বাকীতে জরুরী আসবাব সামগ্রী ও পণ্য বিক্রি একটি অন্যতম প্রক্রিয়া।

প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক ও অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর মুরাবাহা পদ্ধতির মধ্যে বাকীতে বিক্রির ক্ষেত্রটি বেশি বিস্তৃত। তারা সমাজের চাহিদা পূরণে লোকজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঘরসংসারের জরুরী পণ্য যেমন খাট, আলমারী, ফ্রিজ, কম্পিউটার, কৃষিপণ্য, কৃষি সামগ্রী, যেমন ট্রাক্টর, সেচ মেশিন, হালের বলদ, তেল, সার, বীজ ইত্যাদি এবং শিল্প ক্ষেত্রে কাঁচামাল, মেশিনারীজ, পরিবহন ক্ষেত্রে গাড়ী, ইত্যাদি ক্রয় করতে আগ্রহী ক্রেতা গ্রহীতা কিংবা উদ্যোক্তাদের কাছে বাকীতে বিক্রি করে। শহরাঞ্চলে বহুতল বসতবাড়ী তৈরির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মুরাবাহা পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে বাকী বিক্রির ব্যাপারটি একবারে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের শর্তে জায়েয আবার কিস্তিতে টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রেও জায়েয। একসাথে কিংবা কিস্তিতে যেভাবেই ক্রেতা বিক্রেতা মূল্য পরিশোধ ও মূল্য উসূলের চুক্তি করুক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্রেতা ও বিক্রেতা আলোচনা ক্রমে যে কোনো পদ্ধতিই অবলম্বন করতে পারে।

অবশ্য যারা বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক কিংবা অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গ থেকে জরুরী পণ্য সামগ্রীর প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর জন্যে মুরাবাহা পদ্ধতিতে নির্মাণ সামগ্রী কৃষিপণ্য, মেশিনারীজ কিংবা শিল্প সামগ্রী কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ক্রয় করেন, তাদের ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতিগত জটিলতা দেখা দেয়। ব্যাংক বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা আর ক্রেতার অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বিপত্তি। ফলে গোটা ক্রয় বিক্রয়টা সূদী লেনদেনে পরিণত হয়।

আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুরাবাহা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাকীতে পণ্য বিক্রি এবং কিস্তিতে মূল্য উসূলের প্রক্রিয়াটি বেশি প্রচলিত। উল্লেখিত মুরাবাহা পদ্ধতিতে বাকীতে জরুরী পণ্য সামগ্রী বিক্রি এবং প্রচলিত বাজারদর থেকে অনেক বেশি পরিমাণে লাভ করে কিস্তি আকারে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য উসূলের ব্যাপারে কিছু সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত এসব সমস্যা ও প্রশ্নের কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুরাবাহা পদ্ধতি ইসলাম সম্মত নয় বলে অনেকেই মনে করছেন। কিন্তু ব্যাংকগুলো এসব কথা মেনে নিচ্ছে না। সমস্যাগুলো একটু বিশদ আলোচনার দাবী রাখে।

অভিযোগ রয়েছে অর্থ বিনিয়োগকারী বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের কাছে সমাজের বিভিন্ন পেশার লোকজন তাদের প্রয়োজন পূরণ ও চাহিদা মেটানোর জন্যে মুরাবাহা পদ্ধতিতে পণ্য সামগ্রী কিংবা কাঙ্ক্ষিত জিনিস খরিদ করার আবেদন করে। ব্যাংক এসব ব্যক্তির আবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে ক্রেতার সাথে পণ্যের পরিমাণ, মূল্য এবং দাম উসূলের কিস্তি সম্পর্কে আলোচনার পর উভয়ের সম্মতিতে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। এরপর ব্যাংক উল্লেখিত পণ্য সংগ্রহ করে। সংগ্রহ প্রক্রিয়াটি কোন কোন ক্ষেত্রে নগদ এবং বাকীতেও হয়ে থাকে।

সমস্যা ও অভিযোগ

এক. ব্যাংক ও আগ্রহী পণ্য গ্রহিতার মধ্যে প্রথমে কাগুজে চুক্তি হয় এরপর লেনদেন হয়। কাগুজে চুক্তিকে কি ক্রয় বিক্রয় বলা যাবে? বাকীতে পণ্য খরিদ করে ব্যাংক বাকীতে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে, তা কি জায়েয?

দুই. প্রচলিত বাজারদর থেকে কিংবা সূদী ব্যাংকগুলো থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো মুরাবাহা পদ্ধতিতে বাকী ও কিস্তি আকারে মূল্য পরিশোধের শর্তে যা বিক্রি করে তাতে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রশ্ন হলো, প্রচলিত বাজার দর থেকে অনেক বেশি লাভে বিক্রি করা কি শরীয়ত সম্মত? কারণ এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কি মানুষের জরুরী চাহিদা পূরণের অক্ষমতাকে পুঁজি করে শোষণমূলক মুনাফা করছে না ?

তিন. কিস্তি যতো বেশি এবং বিলম্বিত হয় লাভের পরিমাণও হয় ততো বেশি। তাতে বুঝা যায় ক্রেতার বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের কারণে বেশি পরিমাণে লাভ দিতে হয়। বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের জন্যে বেশি পরিমাণে লাভ করা কি শরীয়তে সমর্থনযোগ্য?

চার. ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুরাবাহা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, ব্যাংকের নিজস্ব কোন দোকান পণ্যাগার কিংবা Sales center নেই। ক্রেতার সাথে কাগজে কলমে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর ব্যাংক বাজার কিংবা পণ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে ক্রেতাকে দেয়। এমতাবস্থায় এই চুক্তি কি মালিকানাহীন বস্তু বিক্রির আওতায় নাজায়েয পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় না ?

পাঁচ. অভিযোগ রয়েছে ব্যাংকগুলো ক্রেতার সাথে কাগুজে চুক্তি সম্পাদন করেই ক্রেতাকে টাকা বা চেক দিয়ে দেয়। ক্রেতা নগদ মুদ্রা কিংবা চেক ভাঙ্গিয়ে পণ্য সংগ্রহ করে। এতে আরো একটি সমস্যা হলো যিনি ক্রেতা তিনিই বাজার থেকে পণ্য সংগ্রহ করেন তাতে একই ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতায় পরিণত হয়। সেটি কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

ছয়. সবচেয়ে জটিল ও বহুল আলোচিত অভিযোগ হলো, মুরাবাহা চুক্তিতে ব্যাংকগুলো কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে যেসব জিনিস বিক্রি করে কোন কারণে কোনো ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাংক অপরিশোধিত কিস্তির টাকা প্রাপ্তি বিলম্বের কারণে মাস বা বছর হিসেব কষে কিস্তি খেলাফকারী ক্রেতার জন্যে অবশ্য পরিশোধযোগ্য একটা জরিমানা ধার্য করে দেয়। কিস্তি খেলাফের সময় যত বৃদ্ধি পায় এবং জরিমানার পরিমাণও বিলম্বের সাথে সাথে ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রশ্ন হলো, যৌক্তিক অসুবিধা কিংবা অক্ষমতার কারনে কোন মুরাবাহা পদ্ধতির ক্রেতা যদি কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অপরিশোধিত কিস্তির অংকের সাথে আরো অংক যোগ

করে জরিমানার নামে অতিরিক্ত টাকা নেয়া শরীয়ত সম্মত হবে কি? নিম্নে আমরা উল্লেখিত অভিযোগ ও প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

এক. মুরাবাহা চুক্তির অধীনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্যমূল্য, লাভ ও কিস্তির সময় পরিমাণ ইত্যাদির ব্যাপারে যে লিখিত চুক্তি হয় এটিকে বেচা-কেনা বলা যাবে না অঙ্গীকার হিসেবে অভিহিত করা যায়। অবশ্য বর্তমান সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে চুক্তি হচ্ছে কেনা বেচার প্রাথমিক পর্যায়। অত:পর পণ্য হস্তান্তর ও হস্তগত হলে বেচাকেনা পূর্ণতা পাবে। এক্ষেত্রে চুক্তিকে ক্রয় সম্পাদন বলে অভিহিত করলে মালিকানাহীন জিনিস বিক্রির পর্যায়ভুক্ত হয়ে কেনা বেচা নাজায়েয হওয়ার যে আশংকাটির উদ্ভব হয় তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ যে সব জিনিসের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে জোরালো কোনো সংশয় সন্দেহের অবকাশ নেই, সেইসব জিনিস কব্জায় না থাকলেও মালিকানায় রয়েছে বলে বিক্রি করার পক্ষে ফকীহদের মতামত রয়েছে।

আল্লামা শামী লিখেন, যে জিনিসের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে হাদীসে এ ধরনের জিনিসের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আগে বিক্রি করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ সম্ভাবনাময় জিনিস বিক্রেতার মালিকানায় নাও আসতে পারে।[২]

কিন্তু বাকিতে ক্রয় করে মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রেতার কাছে বাকীতে বিক্রি করা নাজায়েয হওয়ার কারণ নেই। তবে শর্ত হলো, বিক্রেতার বাকীতে কেনার কথা ক্রেতাকে জানাতে হবে। অনুরূপ প্রথম ক্রেতা অর্থাৎ ব্যাংক বাকীতে কিনে যদি মুরাবাহা পদ্ধতিতে বাকীতে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে বেশি লাভে বিক্রি করে তাও জায়েয হবে।[৩] ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে– বিক্রেতা যদি বিলম্বিত মূল্য প্রাপ্তির কারণে পণ্য মূল্য বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ বেশি মুনাফা নির্ধারণ করে তাহলে তা জায়েয। হানাফী, শাফেয়ী, যায়েদ ইবনে আলী ও অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। ইমাম শাওকানীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন।[৪] হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে হিদায়া গ্রন্থের লেখক, হিদায়ার সকল ভাষ্যকার, ফতোয়া শামীর লেখকসহ সকলেই মুরাবাহা অধ্যায়ের আলোচনায় বেশি লাভে বাকী বিক্রিকে জায়েয বলেছেন।[৫]

বেশি লাভে বাকীতে বিক্রি ফকীহদের দৃষ্টিতে বাইয়ে ই'নার মতো। বাইয়ে ই'না হলো, কোন ঋণ প্রত্যাশী ব্যক্তি কোন বিত্তশালী ব্যবসায়ীর কাছে এক হাজার টাকা ঋণের আবেদন করল। ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহীতাকে বললো, আমি তোমাকে নগদ কোন টাকা পয়সা ঋণ বা হাওলাত দিতে পারবো না। তবে আমার কাছে সিমেন্ট আছে। তুমি ইচ্ছা করলে পাঁচ বস্তা সিমেন্ট নিতে পারো। পাঁচ বস্তা সিমেন্টের বর্তমান বাজার মূল্য ১ হাজার টাকা কিন্তু যেহেতু তুমি বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করবে, তাই তোমাকে এর দাম দিতে হবে ১২০০/- টাকা। তখন যদি করয প্রত্যাশী কিংবা ঋণ গ্রহীতা তা গ্রহণ করে এবং ৫ বস্তা সিমেন্ট বাজারে বিক্রি করে ১ হাজার টাকা কব্জা করে তা হলে তা সকল ফকীহের দৃষ্টিতে জায়েয। এমনটি বহু সাহাবায়ে কেরামও করেছেন।

এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়, বাইয়ে ইনা'র মধ্যে মূল্য পরিশোধে অবকাশ দেয়ার কারণে মূল্য বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ আছে, অথচ 'কর্জে হাসানা' (বিনা লাভে হাওলাত) দেয়ার মতো সওয়াবের কাজ থেকে সেখানে বিরত থাকার মতো দোষণীয় ব্যাপারও রয়েছে কিন্তু তবুও বাইয়ে ই'না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো ফকীহর ভিন্ন মত নেই। বস্তুতঃ মুরাবাহা পদ্ধতিতে বাকী বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য বাড়ানোর বিষয়টি জায়েয না হওয়ার কোন কারণ নেই।[৬]

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর হলো, শরীয়তের ভাষায় 'গবনে ফাহেশ' প্রতারণা, অস্পষ্টতা ফাঁকীর বা শোষনমূলক মুনাফার পর্যায়ে পড়ে এমন পর্যায়ের লাভের পরিমাণ থেকে ইসলামী ব্যাংক বা পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

প্রচলিত সূদী ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ লাভ করে ইসলামী ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় যদি তাদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কিছু বেশি নিতে পারে কিন্তু এতো বেশি মুনাফা নেয়ার অবকাশ নেই, যার ফলে ক্রেতা সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইসলামী অর্থনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

এ ক্ষেত্রে বিষয়টিকে দেখা ও মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করবে হারাম হালাল হওয়ার বিষয়টি। বেশি লাভ– বেশি কিস্তি ও বেশি বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের কারণে করা হয়, বিষয়টিকে এভাবে দেখলে হারাম হবে। কারণ বিলম্বের কারণে এক প্রকার দাম আর নগদে একই জিনিস অন্যরকম দাম রাখলে তা হবে হারাম।

এখানে গোটা লেনদেনটি হয় বাকীতে। অতএব যে কারো অধিকার আছে বাকীতে বেশি মুনাফা করে বিক্রি করার।[৮]

ঋণ গ্রহীতা কিংবা ক্রয়কারী যাই বলি তাদের অক্ষমতাকে পুঁজি করে ইসলামী ব্যাংকগুলো মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা করছে এ অভিযোগ উত্থাপন করাই যেতে পারে। বাস্ত বে তা প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে কিন্তু তাতে মুরাবাহা লেনদেন না জায়েয হবে না। কারণ কেউ যদি এক টুকরো কাগজের দাম হাঁকে এক লাখ টাকা আর কোন আগ্রহী ব্যক্তি এক লাখ টাকা দিয়ে তা খরিদ করে নেয় তাহলে প্রচলিত বাজার দরে তা যতো বেশিই হোক না কেন যদি লাভ ও কিস্তি নির্দিষ্ট থাকে আর তাতে বিক্রেতা ও ক্রেতা সম্মত হয় এবং তার মধ্যে কোনো প্রতারনা না থাকে তা হলে বিক্রি শুদ্ধ হবে, এতে কোন ফকীহগণ দ্বিমত নেই।[৯]

ব্যাংকগুলোর নিজস্ব দোকান, পণ্যাগার বা sales center থাকে না তবে অধিকাংশ ব্যাংকের গোডাউন থাকে। সেই সাথে থাকে সেলস কাউন্টার, যে কাউন্টার থেকে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রেতা ও ব্যাংকের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাকে অঙ্গীকার বলা চলে, প্রকৃত ক্রয় বিক্রয় বলা যাবে না। ক্রয় বিক্রয় পণ্য হস্তান্তর ও হস্তগত হওয়ার পূর্ব

পর্যন্ত বাস্ত-বায়িত হবে না। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে এই অঙ্গীকার বা চুক্তি কি ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে অবশ্য পালণীয়?

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে মুমেন যখন কোনো অঙ্গীকার বা চুক্তি করে তখন ঈমানী দৃষ্টিকোণ থেকে তা পালন করা অবশ্যই জরুরী। যদিও বিচারের দৃষ্টিতে এ ধরনের অঙ্গীকার পূরণ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। না হলেও কুরআন কারীমে অঙ্গীকার পূরণ জরুরী বলা হয়েছে।

সূরা বনী ইসরাইলের ৩৪ নম্বর আয়াত, সূরা আল মুমিনূন এর ৮ নম্বর আয়াত, সূরা আল মিরাজ এর ৩২ নম্বর আয়াত এবং সূরা আল বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতে ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূরণকে অবশ্য কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি করা যাবে না তা হলো, ব্যাংক ক্রেতাকে ড্রাফট, চেক কিংবা ক্যাশ কোনো ভাবেই মুদ্রা বা মুদ্রার মূল্যমান ধারণ করে এমন জিনিস হস্তান্তর করে এর বিপরীতে লাভ নিতে পারবে না। তাতে লাভের অংক সরাসরি সূদে পরিণত হবে। মুরাবাহা শুদ্ধ করতে হলে ব্যাংকের নিজস্ব লোক দিয়ে পণ্য খরিদ করে ব্যাংকের পক্ষে পণ্য বুঝে নিয়ে তারপর পণ্য ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে হবে।

ক্রেতার কাছে চেক, কিংবা ড্রাফট হস্তান্তরে একই ব্যক্তির তথা ক্রেতা প্রথমে ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং পরবর্তীতে ক্রেতা হিসেবে পণ্যের মালিক হওয়ার বিষয়টি জটিল। কারণ একই ব্যক্তি একই সময়ে ক্রেতা বিক্রেতা হতে পারে না। এমনটি হওয়ার সুযোগ শরীয়তে নেই। সবচেয়ে গুরুতর যে অভিযোগ আমাদের দেশের ইসলামী অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে তা একটু বিশদ আলোচনার দাবী রাখে।

প্রচলিত মার্কেট থেকে নগদ মূল্যে পণ্য সামগ্রী মেশিনারিজ ও অন্যান্য জিনিস খরিদ করে যাদের বাড়ী, কারখানা, সংসার কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয় তারাই ইসলামী পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে থেকে ঋণ আকারে মুরাবাহা পদ্ধতিতে কিস্তিতে এসব জিনিস সংগ্রহ করে। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কেউ যদি সময় ও ওয়াদা মতো কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ব্যাংকগুলো তাদের আদায়যোগ্য কিস্তির অংকের সাথে জরিমানার নামে আরো অংক যোগ করে দেয়। এই জরিমানা যুক্ত হয় সময়ের হিসেবে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই জরিমানা ধার্য করে কিস্তি খেলাফীর কাছ থেকে কিস্তিসহ আরো অতিরিক্ত টাকা আদায় সূদে পরিণত হবে। আদায়ে বিলম্বের কারণে টাকার বিপরীতে অতিরিক্ত টাকা নেয়া সূদ। এতে একই কেনা বেচার মধ্যে দুই ধরনের লেনদেন হওয়ার বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে ওঠে যা ইসলামী শরীয়তে জায়েয নয়।[১০]

সূদী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের হিসাব পত্রে মূলধনের হিসাব আলাদা এবং সূদের হিসাব আলাদা করে হিসেব কষে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, কিস্তি পরিশোধে

অক্ষম ব্যক্তির উপর ইসলামী-অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কিস্তিকে মূলধন বানিয়ে তার উপর জরিমানার নামে অতিরিক্ত টাকার অংক জুড়ে দেয়। যা সরাসরি চক্রবৃদ্ধি সূদে রূপান্তরিত হয়। কারণ লেনদেন তখনই সূদে পরিণত হয় যখন একই জিনিস থেকে লাভবান হয় এক পক্ষ অন্য পক্ষের কোন লাভ বা স্বার্থ থাকে না। তাই আরবীতে সূদ বা রিবাকে ফজল অতিরিক্ত বা বাড়তি আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কিস্তির সাথে যে বাড়তি অংক যোগ করছে তাতে কিস্তিদাতা তথা ক্রেতার কোনই স্বার্থ নেই স্বার্থ সম্পূর্ণটাই ব্যাংকের। এ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কিস্তির সাথে নতুন করে টাকার পরিমাণ যোগ করা হবে সূদ যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।[১১] এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কিস্তি খেলাফীর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে অবকাশ দিয়ে টাকা উসূলের ব্যবস্থা করবে কিছুতেই জরিমানা ধার্য করা যাবে না।

<u>তথ্যপঞ্জি</u>

১. মজমুয়ায়ে ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া খণ্ড-২৯, পৃঃ ৫০১

২. ফাতওয়ায়ে শামী খণ্ড-৪, পৃঃ ১০৫

৩. ফিকহুস্ সুন্নাহ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৩

৪. রদ্দুল মুহতার খণ্ড-৪, পৃঃ-৪৫৮

৫. ফাতওয়া শামী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭৯

৬. ফাতওয়া শামী ৪র্থ খণ্ড- বাবুস সরফ পৃষ্ঠা-২৪৪

৭. মাজাল্লা ফিকহুল ইসলামী, খণ্ড-৩, মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী, দিল্লী, মুরাবাহা, পৃষ্ঠা-৪৩৩

৮. ইলাউস সুনান খণ্ড-১৪, পৃঃ ১৭৪-১৭৫

৯. ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, পৃঃ ১৪-১৯, কুতুবখানা ইমদাদিয়া দেওবন্দ, ইউপি, ইন্ডিয়া।

১০. ফিকহুস্ সুন্নাহ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৭৩ ও সাবিলুস সালাম খণ্ড ৩ পৃঃ ১৬

১১. আল মাবসুত, সুরখসী খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৮৬ করাচী। মাজাল্লা ফিকহুল ইসলামী খণ্ড-৩, পৃঃ-৪৪৭, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩০, বুখারী শরীফ, কিতাবুল বুয়ু খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩১ ইস্তাম্বুল। মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২১৮ রিয়াদ।

ইসলাম ও সন্ত্রাস

ড. আবদুল মুগনী

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস একটি বিস্ময়কর বিষয়। শিল্পবিপ্লবোত্তর সভ্যতার এটি একটি ভয়ানক বর্বরতা। বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সুবাদে অত্যন্ত গুরুতর কিছু ভুল সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়ান হয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে আবিস্কৃত ফ্রয়েড কর্তৃক সৃষ্ট জীবনের জটিলতার উপর মনোবিজ্ঞানের গভীর অভিনিবেশ এবং মার্কসীয় অদ্ভুত জীবনাচরণ সম্পর্কিত এই বর্বরতা জীবন বৃত্ত, মনোবিজ্ঞান এবং অর্থনীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বার্থবাদিতা ও ক্ষোভের মধ্যে লালিত পালিত সন্ত্রাসীরা হচ্ছে সমাজের অসন্তুষ্ট, সব কিছু পেতে ইচ্ছুক (Irredentist) একটি গোষ্ঠী ।

পশ্চিমা ধারণার একটি আলোচিত অধ্যায় হলো আত্মবিশ্বাসের সংকট। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রতারিত করতে চায়। জীবনের কোন আদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে না। তারা শুধুমাত্র চাতুরীপূর্ণ জীবনমান অর্জনের জন্য লালায়িত। নৈতিক মূল্যবোধ তাদের দ্বারা প্রত্যাহত। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনাই তাদেরকে পরিচালিত করে। আধিপত্যের প্রতিযোগিতা সর্বত্র বিরাজমান। সন্ত্রাসের ভারসাম্য রক্ষায় অস্ত্রের উৎপত্তি হচ্ছে। যার ভাণ্ডার প্রকৃতিগতভাবে প্রলুব্ধ করছে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী ব্যক্তিকে। কিছু সংখ্যক লোক অগ্রগতির ফল একচেটিয়া ভোগ করছে। বাকী জনসাধারণ তাদের এই একচেটিয়া কারবার প্রত্যক্ষ করে অসন্তোষে ফুঁসছে। সম্প্রসারণবাদী মহাশক্তিশালী এ চক্র মানবতার দুর্বল স্তরের উপর ছায়াপাত করছে; যারা একটি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। যারা নিয়মিত যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় তারা তাদের মুষ্ঠি থেকে তাদের সম্ভাব্য অংশ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হচ্ছে, যাদেরকে তারা নিন্দা করছে জবরদস্তী দখলকারী হিসাবে। ভীতি এবং হীনমন্যতার ধারণা তাদেরকে ঘৃণার মহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। যারা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয় তারা তাদের নিগ্রহকারীদের প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে।

উৎপত্তি

সন্ত্রাস ব্যক্তিগত কিংবা গ্রুপ ভিত্তিক হয়ে থাকে। যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উস্কানিতেও মাঝে মাঝে উৎসারিত হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সহিংসতা। ভীতি প্রদর্শন

ও জোর করে অন্যায় দাবী আদায় বর্তমান কালের নিয়মে পরিণত হয়েছে। যারা সন্ত্রাস ও কাউন্টার সন্ত্রাসে জড়িত, কোন আইন বা নীতিই তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে গ্রহণীয় ও যথেষ্ট কার্যকর নয়। দস্যুরা আইনের আশ্রয়চ্যুত, সমাজচ্যুতও বটে। কিন্তু তাদের গডফাদারদের ঐ অপরাধে অংশ রয়েছে যেগুলো তারা ভিকটিমদের উপর ঘটাচ্ছে।

একটি বড় মাপের দুষ্ট চক্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) বিজয়ী শক্তিগুলোর দ্বারা সৃষ্টি হয়। মিত্রবাহিনী নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে। কিন্তু তারা ইহুদীবাদকে সমর্থন করে এবং উপনিবেশবাদ থেকে কখনও ফিরে আসে না। ফল স্বরূপ আলজেরিয়ার উপর ফ্রান্সের আগ্রাসন ও প্যালেষ্টাইনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসন অনেক গেরিলার জন্ম দেয়। তারা আলজিরিয়াতে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সফল হলেও ইসরায়েলী কলোনীতে এখনও তারা সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আল-ফাতাহ্ আন্দোলনের সকল কমান্ডোগণ তাদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারে এবং বর্তমান কালের ফ্যাসিবাদের শৃংখল থেকে তাদের জনগণকে উদ্ধার করতে আজো সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ভিয়েতনামে যা ঘটেছিল তা বড় শক্তিগুলোর দ্বারা ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই ফ্লাশ ব্যাকটি মনে করিয়ে দেয় তদানীন্তন আফগানিস্তানের উপর সোভিয়েত আগ্রাসনকে। এটা মুজাহেদীনদেরকে অদম্য সাহসে যুদ্ধ করতে আরো অধিক অনুপ্রাণিত করে এবং অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা তাদের মাতৃভূমি ফিরে পায়।[১]

সহিংসতা

সহিংসতা নিশ্চিতভাবে সন্ত্রাসবাদের জনক। এটি হচ্ছে সেই পন্থা যা কোন কিছু অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয়। এই দার্শনিক প্রশ্নের সঠিকত্ব ও সমাপ্তি আলোচনা করা কিংবা তার উত্তর দান অত্যন্ত কঠিন। এটি নিশ্চিত এবং পরিষ্কার যে, ধর্ম বিশ্বাস গ্রহন ও পালনে সহিংসতা গ্রহণ করা যেতে পারে না। এটি শুধু মাত্র আন্দোলনের একটি নীতি হতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অজেয় শক্তির বিরুদ্ধে নীতি ও কৌশলের প্রকৃতি ছিল যা সহিংসতার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারতো না। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিপ্লব শোচনীয় ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জকারীদের মধ্যকার স্নায়ু যুদ্ধের সংঘর্ষে একমাত্র নিরাপদ ও নিশ্চিত অস্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। ভারতীয়রা এটাকে দেশ প্রেমের বহিপ্রকাশ মনে করতো। এই দেশপ্রেমিকতা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল যে ভারতের জাতীয় সৈন্যরা নাৎসীদের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেললেও সামগ্রিক ও সাধারণভাবে জনগণের বীর হিসাবে অভিহিত হয়েছিল। তাই জাতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা তারা সমর্থিত হয়েছিলেন যখন বৃটিশরা তাদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার করেছিল।

ভূমিকার বৈপরীত্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটুক বা না ঘটুক সন্ত্রাসীরা সমাজ, রাষ্ট্রের দ্বারা যুগে যুগে নিগৃহীত ও অভিযুক্ত। সময়ের ব্যবধানে বিদ্রোহীদের চরিত্রের প্রতি জনগনের

দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপরীত্য থাকে তা তারা সফল হোক বা নাই হোক। কোন প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে চ্যালেঞ্জকারীরা হয় নিজেরাই শাসক হয়, না হয় স্বাধীনতাকামী কিংবা শহীদে পরিণত হয়ে প্রশংসিত হয়। তাই বর্তমান কালে ইতিহাস চরম রায় প্রদান করে এবং কখনো কখনো বিশেষ ব্যক্তির ওপর আরোপিত অবিচার সংশোধন করে। সুতরাং সমসাময়িক দৃশ্যমান বিষয়কে এই প্রেক্ষিত এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিবেচনা করা উচিত যা আলজেরিয়া এবং ভিয়েতনামে ঘটেছিল তা এখন আফগানিস্তানে ঘটছে।[১] এবং প্যালেষ্টাইনেও তা শীঘ্রই ঘটতে পারে। এগুলো হচ্ছে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং প্রত্যেকটি বিদ্রোহ কিংবা হিংসাত্মক ঘটনাকে সন্ত্রাসী ঘটনা হিসাবে অভিহিত করা যাবে না। কিছু মানুষ আত্মরক্ষার জন্য বা তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নিতে পারে। হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে পারে। কমান্ডো কিংবা গেরিলাদের কোন মিশন পরিপূর্ণ করার টার্গেট থাকতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য প্রক্রিয়া উভয় বিষয়ই তাদের প্রকৃতির উপর বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র তখন ঘটনার বিষয় এবং কোন ইস্যুর সত্যতা আবিষ্কৃত হবে।

সংগায়িত করা কঠিন

তাই সন্ত্রাসবাদকে সংগায়িত করা কঠিন। জাতিসংঘ এই ইস্যুটির ওপর ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর হতে ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ বছর ধরে বিতর্ক জিইয়ে রেখেছিল। কিন্তু সদস্যগণ কোন একটি সুনির্দিষ্ট সংগা দাঁড় করাতে পারেননি। সিরিয়া অভিযোগ করে যে ১৯৫৪ সালে ইসরাঈল একটি সিরীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার মাধ্যমে সন্ত্রাস শুরু করে। লিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া এবং প্যালেস্টাইনে সন্ত্রাসবাদের মদদ দেয়ার জন্য বর্ণবাদী সরকারগুলোকে অভিযুক্ত করে তারপর ইসরাঈল কর্তৃক ইরাকের পারমাণবিক চুল্লি ও আমেরিকা কর্তৃক লিবিয়ার ত্রিপোলী নগরীতে বিমান হামলা ছিল অন্যতম সন্ত্রাসী কার্যক্রম। আমেরিকা কর্তৃক ইরানের উপর কমান্ডো আগ্রাসনটিও ছিল একই ধরনের।

নিকারাগুয়া, পোল্যান্ড এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের উপর সংঘটিত ঘটনাও একই ইঙ্গিত বহন করে। তাই পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দেশ কানাডা, জাপান, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, ইসরাঈল ও আমেরিকা সকলেই একমত যে, সন্ত্রাসবাদের সংগা প্রদান সম্ভব নয়।

আলবেনিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসবাদের শুরু এবং বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছে। যা উৎসারিত হয়েছে আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েতনাম, ইরান, গ্রানাডা, লেবানন ও নিকারাগুয়া কিংবা ইসরাঈল কর্তৃক প্যালেস্টাইন, লেবানন ও অন্যান্য আরব বিশ্বের উপর, দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক তার নিজ দেশ ও নামিবিয়ায় অথবা রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসন এর মধ্য দিয়ে। অবশ্য জাতিসংঘ রাষ্ট্রীয় পর্যায় সহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেয়া সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে সাধারনভাবে নিন্দা জানায়। রেজুলেশনটি ১৫৩ ভোটের বিপুল ব্যবধানে পাস হয়েছিল। শুধুমাত্র ২ টি সদস্য রাষ্ট্র ভিন্ন মত পোষণ করেছিল কিংবা ভোটদানে বিরত ছিল।

স্বাধীনতার আগের আফগানিস্তানের চিত্র ছিল নৃশংসতা ও সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস। যদি কেউ কিংবা কোন আদর্শিক গোষ্ঠী, কোন সরকার নির্দোষ জনসাধারণকে অত্যাচার কিংবা নির্যাতন করে তাহলে সন্ত্রাসীর জন্ম হয়। মানবতার এই ধরনটি নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও অপব্যবহারে জর্জরিত। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সভ্য সমাজের একটি অনাকাঙ্খিত অঙ্গ। তারা হয় নৈরাশ্যবাদী, ক্ষিপ্ত এবং নিষ্ঠুর। তাদের কোন আদর্শিক গাইডলাইন নেই এবং জীবনের কোন নৈতিক মূল্যবোধ তাদেরকে পরিচালনা করতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তি নিজেই নিজের আইন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কোন সীমা থাকে না শুধু তার ইচ্ছা পূরণ কল্পে সে যে কোন পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে। তার বিবেক মৃত। তার প্রকৃতি বিদ্বেষমূলক এবং চরিত্র সন্দিগ্ধ। সে নিজেকে অনেক বড় মনে করে এবং তার লাম্পট্য উপভোগ করে। তার ব্যক্তিত্ব বিপথগামী এবং মানসিক অবস্থা নাশকতামূলক। অসৎ অভ্যাস এবং কর্মকাণ্ডের জন্য সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মানুষ নামের এ সব ভয়ংকর প্রাণী পৃথিবীর জন্য দুঃখজনক এবং মানবতার জন্য অভিশাপ।

মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো সন্ত্রাসবাদের আলোকে মৌলবাদের ধুয়া তুলছে যেন এই দুইয়ের মাঝে কোন রকম সংযোগ রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ করে খ্রিষ্টানদের ধ্যান ধারণায় এই প্রেক্ষিত রচিত হয়েছে। ইউরোপে চার্চ ও রাষ্ট্রের মাঝে সৃষ্ট মধ্যযুগীয় সংঘাত রাষ্ট্রের পক্ষে সমাধান দিয়েছিল। এই সময় থেকে পার্থিব জীবনের বিষয়ে ধর্মের উপর গোঁড়াদের (Orthodox) জেদ অননুমোদিত হয় এবং পিউরিটানদের মতবাদকে বিদ্রুপ করা হয়। বিচ্যুতি ও অব্যাহত বিকাশের অজুহাত দিয়ে ক্যাথলিক মতবাদ প্রশংসিত হয়। একটি জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চ প্রশংসার এই প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভব হয়। পশ্চিম ইউরোপের রোমের ক্যাথলিক চার্চ আর পূর্ব ইউরোপের বাইজান্টাইনের অর্থোডক্স চার্চ এই রূপে ব্যক্তি পর্যায়ে নির্বাসিত হয়। খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের মাঝে একটি ধর্মীয় খারাপ পরিণতি ছিল এবং কিছু ধার্মিক মানুষ তাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারা খ্রিষ্টানত্বের মৌলবাদিত্ব পুনরুজ্জীবনে এবং মূল পুনরুদ্ধারে আগ্রহী ছিলো। এবং তাদের পুনরুত্থানবাদকে মৌলবাদ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদিতে বাধাদানে প্রচেষ্টাকারীদেরকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে দমন করার জন্য স্থাপিত বিচারালয়ে সোপর্দ করার ভয় দেখাতো এবং অতীব পিউরিটান কর্তৃক বুদ্ধিজীবিদের ওপর নির্যাতন চালাতো। এইভাবে তারা ধার্মিক ব্যক্তিদের আশা আকাঙ্খাকে তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করতে চাইত।

মৌলবাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে চরম মতবাদ, যার অন্য নাম হচ্ছে সামগ্রিক বিদ্রোহ। সকল সামাজিক বিদ্রোহী ও সংস্কারক হচ্ছে চরম মতবাদী যারা একটি সমাজকে আবৃত

ও বিভ্রান্ত করে পুরনো ও জীর্ণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করে। তারা ইতিহাসের সম্মুখীন হয় প্রগতিশীল হিসাবে।

ইসলামী মৌলবাদ

অবশ্য ইসলামী মৌলবাদীগণ ইসলামের ইতিহাসে সর্বদাই একটা ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে এসেছে। ইসলামে প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠা আলোকবর্তিকা স্বরূপ। নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ সর্বদাই ইসলামে নৈতিক চরিত্র ও আচার আচরণের পুনসংস্করণ বলেই বিবেচিত হয়েছে। উন্নত জীবনের ধারনা এবং ধর্মীয় আচরণ ইসলামী মৌলবাদের বিশুদ্ধতার ছাপ (Hallmark) বলেই বিবেচিত। আধুনিক ইতিহাসে বিশ্বের ওপর পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্যের প্রেক্ষিতে, ইসলামী মৌলবাদীগণ মুক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। তারা মানুষের কাঁধ থেকে বিদেশী জোয়াল ফেলে দিতে এবং তাদের নিজেদের বাড়িতে দাসের পরিবর্তে প্রভু হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। তারা রাজনৈতিক বিদ্রোহী এবং সমাজ সংস্কারক। কার্যত স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালবাসা আল্লাহ ভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারা শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই আত্মসমর্পণ করে যাতে করে তারা অন্য কোন মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে। এভাবে তারা আল্লাহ ভক্তির উপর গুরুত্ব দেয় এবং ন্যায়পরায়ণতা লালন করে।

ইসলাম এবং সন্ত্রাস

এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দৃঢ় আস্থা ও সুনির্দিষ্ট ভাবেই বলা যায়, ইসলাম ও সন্ত্রাসের মাঝে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই তা সে যে কোন ধরনের ই হোক না কেন, তারা দুটি ভিন্ন মেরু। ইসলাম আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বুঝায়, এবং এর অর্থ হলো শান্তি। তারপর ঈমান শব্দটি বিশ্বাসের কৌশলগত অর্থ যা 'আমান' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থও হলো শান্তি। ইসলাম আল্লাহকে ভয় করতে বলে, তাহলে কিভাবে ইসলাম একজন অপরজনকে ভয় দেখাতে বলবে? আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী অনুগতদের বিশ্বাস অন্যের নিকট কাউকে আত্মসমর্পণ করতে বলে না। ভীতি প্রদর্শন ও প্রতারণা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী।

ইসলামের অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো। যার অর্থ হলো 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। প্রত্যেক কাজ শুরু করার পূর্বে 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি" একথা বলার তাগিদ দেয়া হয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে। কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরা 'আল ফাতিহা'-তে আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল এই প্রার্থনা করা হয়েছে। এটা ঐ একই রূপ যাতে একজনকে প্রতিটি কাজ শুরুর পূর্বে (তাঁর) দয়া কামনা করে প্রার্থনা করতে হয়। এসব কিছুই ইসলামী সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্র কে নির্দেশ করে যা পরিপূর্ণ শান্তি, স্থিতি, স্নেহ মমতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভালবাসা দয়া ও মমতা বিশ্বাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে আল্লাহর ধারণা

এই প্রেক্ষাপটে ইসলামে আল্লাহর ধারনাকে পরিপূর্ণ রূপে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আমরা শুধুমাত্র তার প্রধান প্রধান গুণাবলী দেখেছি এখন এটা বলা প্রয়োজন যে, এগুলো আরোপ করা হয়েছে এমন একজনের জন্য, 'যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা' (রাব্বুল আলামীন)। কুরআনুল কারীমের প্রথম আয়াতেই রাব্বুল আলামিন কথাটি এসেছে। 'রব' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাধারণ ও আংশিক অর্থ হলো পালন কর্তা। বিশ্লেষকগণ 'রব' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যেমন ভালবাসা রয়েছে তেমনিভাবে আল্লাহরও প্রত্যেকের প্রতি রয়েছ ভালবাসা; যদিও আত্মিকভাবে আল্লাহ মানব জাতির কারো সঙ্গে সম্পর্কিত নন। ইসলামের একত্ববাদের ধারণা খ্রিষ্টানদের ত্রিতত্ত্ববাদের ধারণার বিপরীত। পবিত্র কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো মানবতার জন্য স্বর্গীয় ভালবাসার অমীয় বাণী বহন করেঃ- 'আল্লাহ বলেন, আমি শাস্তি দেই তাকেই যাকে ইচ্ছা করি অন্যথায় সকল বস্তুর প্রতি আমার ভালবাসা রয়েছে'। (আল আরাফ-১৫৬)'আল্লাহ তার নিজের জন্যই দয়া দানশীলতাকে বাধ্যতামূলক করেছেন'(আল আনআম-১২) 'আল্লাহ যদি ভূ- পৃষ্ঠে মানুষের সম্পাদিত কাজের হিসাব নিতেন তাহলে কোন জীব জন্তুকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এগুলোকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।' (ফাতির-৪৫)

ইসলামের নবী স.

আল্লাহ যেমন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং সংরক্ষক তেমনি ইসলামের সর্ব শেষ নবী হযরত 'মুহাম্মদ স. সমগ্র মানবতার জন্য দয়া ও আশীর্বাদ স্বরূপ। আল্লাহ বলেন 'আমি তোমাকে সমগ্র মানবতার জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠিয়েছি।' (আল- আম্বিয়া-১০৭)রসূলুল্লাহ স. এর একটি বাণী পবিত্র কুরআনুল কারীমের উক্ত আয়াতটিকে আরো সুদৃঢ় করেছে– 'সকল সৃষ্টিই আল্লাহর সন্তান (সমতুল্য) সুতরাং আল্লাহ তাকেই বেশী ভালোবাসেন যে তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।' সুতরাং নবী স. কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে 'দয়া ও আশীর্বাদের' মূর্ত প্রতীক হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে এবং তার নম্রতা এবং বিনয় আল্লাহর বাণী দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই হযরত মুহাম্মদ স. এর শরীয়াহ সমগ্র মানবতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বিধান। এটা সকল মানুষকে শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার শিক্ষা দেয়।

প্রতিদানের আইন

ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচারের ধারণা প্রতিদানের প্রাকৃতিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত যা অবস্থা-অবস্থান নির্বিশেষে দোষগুণের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করে। এই নীতির ভিত্তি হলো 'যেমন কর্ম তেমন ফল', প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কাজ অনুযায়ী ফলাফল ভোগ করবে। 'কেউ যদি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে তবে সে তার প্রতিদান লাভ করবে, আর যদি কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে তবে সে তার প্রতিদান লাভ করবে '। (সূরা যিলযাল,৭-৮)

'মানুষের কর্মের কারণে ভূমিতে ও পানিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, যাতে করে আল্লাহ তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের পরিণতি আস্বাদনে বাধ্য করেন।' (আর রুম-৪১)

'তোমাদের প্রভু নৃশংসভাবে কোন স্থান ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ সে স্থানের অধিবাসীগণ সংস্কার সাধন করে।' (সূরা হুদ-১১৭)

'যদি আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে থাকে তাহলে কেন আল্লাহ তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবেন?' (আন-নিসা-১৪৭)

'যদি আল্লাহ কিছু লোকের পরিবর্তে তাদের মত কিছু লোককে না নিয়ে আসতেন তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো কিন্তু আল্লাহ বিশ্বের প্রতি প্রসন্ন।' (আল বাক্বারা-২৫১)

ইসলামে অপরাধ আইন

ইসলামে অপরাধ আইন প্রতিদানের স্বাভাবিক আইনকে বিধিবদ্ধ করে। ইসলামের বস্তুগত ধারনায় বিচার অবশ্যই স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। সেখানে বাধা থাকবে না কিংবা অতিরিক্ত সাংবিধানিক বিবেচনায় পরিবর্তন বা বিকৃতিকরণ করা যাবে না। আইনের দৃষ্টিতে সকল নর ও নারী সমান। যারা নিষ্ঠুরতায় ব্যাপৃত তাদের কোন অজুহাতেই ছাড়া যাবে না। এর পর অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা। আমলযোগ্য ও প্রমাণিত হলে শাস্তি অনিবার্য। এভাবে সকল সম্ভাব্য দুস্কৃতকারীর জন্য এটা হতে হবে কঠোর হুঁশিয়ারী। সাধারণ মানুষের নৈতিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এধরনের নোংরামী, এ ধরনের সকল দুস্কৃতকারীকে দূরীভূত এবং আবর্জনা মুক্ত করতে হবে। এর অর্থ হলো সকল উপায়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু ইসলামে সাক্ষ্য আইন অত্যন্ত কঠিন। অসমর্থিত কোন সাক্ষ্য দ্বারা কোন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে এমন কিছুকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। সুতরাং চূড়ান্তভাবে দোষী প্রমাণিত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না, অপরাধ চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হলে তখন তার উপর কোন ধরনের অনুগ্রহ দেখানোর সুযোগ নেই।

'তাওরাতে আমরা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত; এভাবে সকল ক্ষতির প্রতিশোধ হবে। যদি কেউ ক্ষমা করে দেয় তবে সেটা তার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর অনুশাসন অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে না তারা অত্যাচারী।' (আল- মায়িদাহ, ৪৫)

'হে বিশ্বাসীগণ! হত্যার ক্ষতিপূরণ হত্যা। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কাউকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে স্বাভাবিক ও যথাযথ ভাবে রক্তের মূল্য নির্ধারণ ও পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমার প্রতিপালকের

পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও ক্ষমা। এর পরেও যদি কেউ সীমা লংঘন করে তা হলে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। হে জ্ঞানী মানুষ! হত্যার বদলে হত্যায় তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন। বিধি লংঘন থেকে বিরত থাকবে এটা তোমাদের কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে।' (আল বাক্বারা- ৭৮)

এভাবে ন্যায় বিচার ও ক্ষমার সমন্বয় ঘটেছে ইসলাম কর্তৃক উদ্ভাবিত অপরাধ আইনে। অপরাধীগনের আইন আদালতে কোন অনুগ্রহ প্রাপ্তির সুযোগ নেই। আদালত শুধু বিধিবদ্ধ আইন মোতাবেক রায় প্রদান করবে। শাস্তি প্রদানের পরে নালিশকারী ইচ্ছা করলে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা শাস্তির ভার লাঘব করে দিতে পারে। এভাবে বিচার ও সুষম পদ্ধতিতে অপরাধীর শাস্তি হয় এবং নালিশকারীর ক্ষতি তার সন্তুষ্টি মোতাবেক পুষিয়ে দেয়া হয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং বিশ্বাসীদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে সকল শর্তাবলী পূরণ হয়।

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা থেকে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। উদারনৈতিক সংস্কারের নামে পশ্চিমা বিশ্ব অপরাধীদেরকে আরো অধিক অপরাধ প্রবণ করে তুলছে। পশ্চিমা বিশ্বের কারাগার ব্যবস্থায় কারাগার গুলো স্বাস্থ্যকর ও বিলাসবহুল বাড়িতে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থা বিচারের মর্মবাণীকে ক্ষুন্ন করে এবং মানব প্রকৃতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্বে অপরাধ অনবরত সংঘটিত হচ্ছে আর মুসলিম দেশ যেখানে শরীয়াহ আইন বলবত রয়েছে সে সব দেশ বহুলাংশে অপরাধমুক্ত রয়েছে। ইসলামে অপরাধ আইনকে ইসলামী জীবন বিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখতে হবে যা সমাজে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং তা সমাজে অপরাধীদেরকে অপরাধের উৎস হতেই চির নির্মূল করে দেয়।

যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে ইসলামী ধারনা

ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তির ধারনা জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যখন আদমের সন্তান কাবিল প্রথম খুন করে তার ভাই হাবিলকে সে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ- 'এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নর হত্যা অথবা দুনিয়াতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে, সে যেন দুনিয়ার সকলের প্রাণ রক্ষা করল।' (আল মায়িদাহ-৩২)

দাঙ্গা ইসলামের চেতনার পরিপন্থি

'অন্য বিশ্বে আমরা ঐ গৃহ নির্মাণ করছি তাদের জন্য যারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি, না তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করে। এবং সেই নেককার লোকদের জন্যই পরম মঙ্গল নিহিত।' (আল কাসাস -৮৩)

ইসলামী জীবনের ধারনা এই ইঙ্গিত দেয় যে, পৃথিবীকে আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের জন্য অনুকুল করে গড়ে তোলা হয়েছে, যিনি তার নবীগণকে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীর উন্নয়ন

ঘটানোর জন্যঃ'পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা এতে বিপর্যয় ঘটিও না। আল্লাহকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে।' (আল- আরাফ ৫৬)

'এটা এই পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্যের পরামর্শ দেয় যাকে কখনোই বিরক্ত করা যাবে না। সুতরাং নিষ্ঠুরতার দ্বারা যারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তাদেরকে তাদের মতো করেই প্রতিদান দেয়া হবে এবং কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে' :-'যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাওই তবে ঠিক ততখানি নিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য এটাইতো উত্তম'। (আল নাহল-১২৬)'যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে সীমা লংঘন করে, তুমিও তার বিরুদ্ধে লংঘন করতে পারো যতটুক পর্যন্ত সে করেছে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন'। (আল বাক্বারা -১৯৪)

সকল প্রকার উস্কানি ও আগ্রাসনের জবাবে সংযম ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ তাদের প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত।

'যারা নিহত হলো তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ অনুমতি প্রাপ্ত, যেমনটি তারা নির্যাতিত এবং আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।' (আল হজ্জ-৩৯, ৪০)

কিন্তু 'জিহাদের' জন্য এই অনুমোদন কতিপয় শর্তসাপেক্ষঃ- 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমা লংঘন ' করোনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘন কারীদেরকে ভালোবাসেন না।' (আল বাক্বারা-১৯০)

আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি থাকা সত্ত্বেও শান্তির জন্য সদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন- 'তারা যদি শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সে দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো।' (আল আনফাল-৫৮)

যুদ্ধ ও শান্তির এ শর্তাবলী নিশ্চয়ই চমৎকার, অত্যন্ত যুক্তিসম্মত এবং অতি সভ্য। ধৈর্য, অকপটতা, সমতা এ শর্তাবলীর সাথে সম্পর্কিত। ইসলামে যুদ্ধ সত্যিকারার্থেই যে কোন রকম ছল চাতুরী ও কপটতা মুক্ত শান্তির অর্থবোধক, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সৈন্যগণ মিশনারী স্বরূপ, ভাড়াটে সৈন্য নয়।

ইসলামে সহিষ্ণুতা

আইনের একটা স্বাভাবিক পথ রয়েছে তা সত্ত্বেও তার বাইরে ইসলাম তার অনুসারীগনকে সকল সময় অধিকতর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ প্রদান করে। অন্যান্য লোকজনদের ক্ষেত্রে আচরণের বেলায়ও একই রকম নির্দেশ প্রদান করে। 'ধর্মীয় বিভিন্নতা সহ্য করতে হবে এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। ধর্মে কোন বল প্রয়োগের ব্যবস্থা নেই'। (আল বাক্বারা-১০৮)

'আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না' (আল আনআম-১০৮)। সকল ধর্মালম্বী কর্তৃক এমনকি একটা অভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে:- 'কিতাবীদের তুমি বল আমাদের মধ্যে যা অভিন্ন সে বিষয়ে তোমরা এসো যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরিক না করি এবং আমাদের কাউকে কেউ আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করে। (আলে ইমরান-৬৪)

মতপার্থক্য এমনকি দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকা সত্ত্বেও অন্যের সাথে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে:- '(সেই সব) লোকের প্রতি তোমাদের ক্রোধ, যারা পবিত্র মসজিদে যাওয়াকে বাধা দেয় তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে, পূণ্যবান ও আল্লাহ ভক্তদের সঙ্গে তোমরা সহযোগিতা কর গুণাহগার ও দুষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করোনা।" (আল মায়িদাহ-২)

বুদ্ধিমত্তা এবং যৌক্তিকতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথে প্রচার করতে হবে

'মানুষকে তোমার রবের প্রতি আহ্বান কর বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতার সাথে এবং তাদের সাথে যুক্তি তর্কের অবতরণা কর সর্বোত্তম পন্থায়। অত্যন্ত নম্রভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন ও করা যায়'- 'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু।' (হামিম সিজদাহ-৩৪)

ইসলামে সহিষ্ণুতার সীমা রেখার আর একটি নমুনা হল, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী ও রসূলের উপর বিশ্বাস রাখা:-'তারা নবী ও নবীদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে না, এই ঘোষণার সাথে সকল বিশ্বাসীগণ আল্লাহ তার ফেরেশতা আর সকল কিতাব এবং তার সকল নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।' (আল বাক্বারা ২৮৫)

এটি হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদের সেই নীতি যার উপর ভিত্তি করে সকল ধরনের মর্যাদা নিরূপন করা হয় এবং 'হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একটি মাত্র পুরুষ ও একটি মাত্র নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বহু জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে পার। নিসন্দেহে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে পূণ্যবান।' (আল হুজরাত-১৩)

ইসলামে সন্ত্রাসবাদের ধারনা

উপরিউক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে আস্থার সাথে বলা যায় যে, ইসলাম সমাজ থেকে সন্ত্রাসকে উৎখাত করতে এবং সকল ভয় দেখানো ও অন্তর্ঘাত মূলক কর্মকাণ্ড থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে চায়। আর এ কারণে কুরআন বিশ্বাসীদের অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় করার ঘোষণা দিয়েছে যা এর সঙ্গে যে কোন রকম সহিংসতার মিশ্রণ বিহীনভাবে সমুন্নত ও লালন করতে হবে। পূর্ণ বিশ্বাস অর্থ হচ্ছে পূর্ণ শান্তি:-

'বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি কামনাকারী, যারা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে এবং সহিংসতার সাথে তাদের বিশ্বাস মিশ্রিত করে না শুধু একমাত্র তারাই শান্তির হকদার এবং তারাই সঠিক পথে।' (আল আনআম, ৮১,৮২)

কুরআনে বিশৃঙ্খলাকে খুনের চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে

'ফিতনা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায়'। (আল বাক্বারা -২১৭)। সুতরং একবার যদি প্রমাণিত হয় যে সন্ত্রাসীরা প্রকৃত পক্ষেই ব্যক্তিগত লাভের ও স্বার্থের জন্য নির্দোষ ব্যক্তিদের সন্ত্রস্ত করে তাহলে ইসলামী আইনের আওতায় তাদেরকে কঠোরভাবে মোকাবেলা করতে হবে। তারা ক্ষতিকর রোগ জীবাণু যা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। স্বার্থপর অত্যাচারী যারা মানবতাকে বিপর্যস্ত করে তাদেরকে কখনো সহ্য করা যাবে না। তারা মানব শরীরে ক্যান্সারের সমতুল্য এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের 'আল মাইয়েদার' ৩য় আয়াত এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করে যে, অনুশোচিত হওয়ার পূর্বে যদি দাঙ্গাকারী ধরা পড়ে তাহলে তাকে তরবারির সম্মুখে দাড় করাতে হবে নতুবা ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে।

অনুবাদ: নূরুল ইসলাম সরকার

যৌতুক সামাজিক অশান্তি ছড়িয়ে দেয়

অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান

যৌতুক কাকে বলে ?

যৌতুক অর্থ উপহার উপঢৌকন।

বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষ কনে পক্ষের কাছ থেকে বিবাহের আগে বিবাহের সময় কিংবা বিবাহের পর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শর্ত আরোপ বা দাবী করে যে, সমস্ত অর্থ সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ বা অন্য যা কিছু আদায় করে তাকেই যৌতুক বলে। শর্ত আরোপ না করেও সামাজিক রেওয়াজের পায়রবী করে কনে পক্ষের তরফ থেকে যদি বর পক্ষকে ঐ ধরনের কিছু দেয়া হয় তাও যৌতুকের আওতায় পড়বে।[১]

বিবাহের কোন পক্ষ অন্য পক্ষকে বর বা কোন এক পক্ষের মা-বাবা কর্তৃক বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিবাহের সময় বা বিবাহের আগে বা বিবাহের পরে যে কোন সময় পণ হিসেবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতই হচ্ছে যৌতুক।[২] যৌতুকের বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি বাস্তব ঘটনা পেশ করা হল। যা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পীরগাছা গ্রামের আজিমের ছোট পরিবার। আজিম গরীব কিন্তু ভদ্র। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে জন্ম নিল একটি মেয়ে নাম তার রেবেকা। রেবেকা পিতা মাতার খুবই আদরের। রেবেকা যা খেতে চায়, পরিধান করতে চায় পিতা তা এনে দেয়। একটু বড় হলে অন্য দশটি ছেলে-মেয়ের মত রেবেকাকেও স্কুলে পাঠায়। রেবেকার জন্য নতুনন বই আনে, ছবির বই আনে। সে ভারী খুশী। মেয়ে প্রাইমারী শেষ করে হাই স্কুলে ভর্তি হয়। সে এস এস সি পরীক্ষায় পাশ করে। বাবা আজিমের আর্থিক অভাবের কারণে কলেজে ভর্তি করতে পারে নি। যদিও রেবেকার পড়াশোনা করার খুবই ইচ্ছা ছিল। রেবেকা এখন বড় তাই পিতা মাতা তাকে বিবাহ দেয়ার কথা ভাবছে। পাশের গ্রামের জিন্নাত আলীর ছেলে মতিউর রহমান কালুর সাথে রেবেকার বিয়ে পাকা হয়ে যায়। তবে শর্ত ছেলেকে পনের হাজার টাকা নগদ ও একটি হাত ঘড়ি দিতে হবে। আজিম একটি সম্পদশালী লোকের সন্তানের নিকট মেয়ে বিয়ে দিতে চায়। যাতে ভবিষ্যতে রেবেকা সুখী হতে পারে। তাই আজিম যৌতুক দিয়েও মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হয়। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয় ১৫ ফাল্গুন। এদিকে মেয়ের বাবা যৌতুকের টাকা সংগ্রহের জন্য বাগানের গাছ ও হালের গরু বিক্রি করতে শুরু করেছে। কিন্তু রেবেকা

লেখক : প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও সংগঠক।

পিতাকে নিষেধ করে বলল যে, হালের গরু বিক্রি করে বিয়ে করতে আমি রাজি নই। পিতা বললেন, মা! তোমাকে বিয়ে দিয়ে আমি সব কিছু ঠিক করে ফেলব। হালের বলদ ক্রয় করে আবার চাষাবাদ শুরু করব। তুমি আমার কাজে বাধা দিও না!

বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু আজিম এখনও সব টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি, তাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। আজিম জিন্নাত আলীর নিকট গেল। সে বলল, ভাইসাব আমি সম্পূর্ণ টাকা যোগাড় করতে পারি নি। এখন কি করি ? তবে কথা দিচ্ছি বিয়ের পর বাকী টাকা তিন মাসের মধ্যে যোগাড় করে দেব। ছেলের বাবা জিজ্ঞেস করল কত টাকা যোগাড় হয়েছে ? আজিম বলল, দশহাজার টাকা। জিন্নাত আলী বলল, বিয়ের পূর্বের দিন দশহাজার টাকা আর বিয়ের দিন ঘড়ি দিবেন। আর বাকী টাকার ওয়াদা যেন ঠিক থাকে।

১৫ ফাল্গুন রেবেকার বিয়ে হয়ে যায়। রেবেকা তখন স্বামীর বাড়ি। দিনগুলো রেবেকার ভালই কাটছে। নতুন জায়গা ও নতুন পরিবেশে মনের আনন্দে দিন কাটছে রেবেকার। শ্বশুর শাশুড়ী তাকে খুবই আদর যত্ন করছে। 'বউ মা' বলে ডাকছে। তিন মাস চলে গেল বউর বাবা এখনও পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারেনি। তাই সকলের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্বশুর শাশুড়ী তাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না। স্বামীর নির্যাতন দিন দিন বাড়তে থাকে। উঠতে বসতে খেতে শ্বশুর শাশুড়ী তাকে টাকার খোঁটা দেয়। শাশুড়ী কথায় কথায় যখন তাকে ফকিরের মেয়ে বলে রেবেকা তখন ভারি দুঃখ পায়। তারা তো তার রূপ গুণ দেখে শুনেই বৌ বানিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন কেন এসব করে ? এদিকে রেবেকাকেও তার বাবার বাড়িতে যেতে দেয়া হয় না। রেবেকার স্বামী কালু তাকে নানাভাবে গালমন্দ ও নির্যাতন করে। কথায় কথায় খোটা দিয়ে বলে, তোমার বাবা টাকা পরিশোধ করে না কেন ? তুমি গিয়ে টাকা নিয়ে এসো।

কত আর খোঁটা ও অত্যাচার সহ্য করবে। একদিন রেবেকা বাবার নিকট টাকা চাইতে বাবার বাড়িতে গেল। এদিকে বাবার অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক খারাপ। তাকে বিয়ে দিতে গিয়ে তার বাবা নিস্ব হয়ে পড়েছে। ছোট ভাইয়ের অসুখ। অষুধ কেনার পয়সা জোগাড় করতে পারছে না বাবা। ছোট ভাইর করুণ অবস্থা দেখে রেবেকা আর টাকা চাওয়ার সাহস পায় না। সে খালি হাতেই শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসে। শ্বশুর বাড়িতে এসে বাবার দুরবস্থার কথা স্বামীকে খুলে বলে। কিন্তু এসব দুঃখের কথা শুনেও তার স্বামীর মনের কোন পরিবর্তন হয় না। রেবেকার প্রতি তার রাগ আরও বেড়ে যায়। কালু বলে, তোমার বাবা একটা মিথ্যাবাদী। রেবেকা বলে, দেখ আমাকে যা বলছ বল। কিন্তু আমার বাবার নামে কিছু বলবে না। আমার বাবা গরিব হতে পারে কিন্তু মিথ্যুক নয়। কালু বলে, তোমার বাবা শুধু মিথ্যুকই নয়, একটা চোর। বাবাকে চোর বলাতে রেবেকা খুব রেগে যায়। তখন সে বলে, চোর তো তোমরাই। তোমার বাবাতো অন্যের জমি দখল করেছে। একথা শোনার পর কালু রেবেকাকে খুব মারধর করে। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রেবেকার শাশুড়ী তার শ্বশুরকে বলে ভালই করেছে কালু। আচ্ছা মতো

ছোটলোকের মেয়েটাকে পিটিয়েছে। ঐ ফকিরের বেটির একটু শাস্তি হওয়া দরকার। শ্বশুর বলে, দেখ বউ মরেছে নাকি ? মরে গেলে গলায় রশি বেঁধে খুটিতে ঝুলিয়ে রাখতে বল। তুমি চিৎকার করতে থাক। আর বলতে থাক বউ গলায় রশি দিয়েছে। তা না হলে পুলিশ আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে যাবে। কালুর মা ছেলের ঘরে যান। দেখেন বউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তবে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে ছেলেকে বলে, আয় বাবা, দুটো ভাত খেয়েনে। সারাদিন তো ডাইনিটা তোকে জ্বালিয়ে মেরেছে। কালু মায়ের সাথে খেতে যায়। রেবেকার জ্ঞান ফিরলে দেখে সে একা শুয়ে আছে। সে ঠিক করল এ বাড়িতে আর থাকবে না। কোন রকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক প্রতিবেশির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে প্রতিবেশীর সহায়তায় রাতেই বাবার বাড়ি চলে যায়। রেবেকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এ জুলুমের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তাই পরদিন আদালতে উপস্থিত হয়ে নারী নির্যাতন ও যৌতুকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পুলিশ এসে মতিউর রহমান কালুকে গ্রেফতার করে। কালু এখন জেল হাজতে। সে কিছুদিন পর জামিনে মুক্তি পায়। লোকজন সাথে নিয়ে শ্বশুরের বাড়ি পীরগাছায় এসে শাশুড়ীকে এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেয়।

গত ২৯ জুলাই ২০০৪ জাতীয় পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আমেনা বেগমকে এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেয় এক পাষণ্ড জামাই। গুরুতর আহত অবস্থায় শাশুড়ী আমেনাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। বাঘার পীরগাছা গ্রামে সোমবার রাতে দলবল নিয়ে শ্বশুর আজিমের বাড়ি এসে পাইক পাড়া গ্রামের জিন্নাত আলীর পুত্র মতিউর রহমান কালু তার শাশুড়ী আমেনা বেগমের উপর এসিড নিক্ষেপ করে তার সমস্ত শরীর ঝলসে দেয়। এর আগে কালু তার স্ত্রী রেবেকার দায়ের করা যৌতুক বিরোধী মামলায় জেল খেটে জামিনে বেরিয়ে আসে। কয়েক মাস পূর্বে কালুর সঙ্গে রেবেকার বিয়ে হয়েছিল।[৩] এ হলো একটি ঘটনার করুণ চিত্র। এরূপ প্রতিদিন অনেক ঘটনা ঘটছে যৌতুকের কারণে। যৌতুকের কারণে পরিবারে কলহ, তালাক, স্ত্রীর ওপর নির্যাতন, স্ত্রীকে হত্যা, স্বামীকে হত্যা, পঙ্গু করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদ ইত্যাদি অগণিত ঘটনা ঘটছে।

উক্ত ঘটনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

২. যৌতুকের কারণে রেবেকা ও কালুর মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা গড়ে ওঠেনি।
৩. যৌতুকের কারণে স্ত্রীর চেয়ে সম্পদ অধিক মূল্যবান হয়ে গেলো।
৪ যৌতুকের কারণে স্বামী কালু স্ত্রী রেবেকাকে অমানবিকভাবে মারলো।
৫. যৌতুকের কারণে শ্বশুরের কোন অসুবিধার কথা জামাই শুনতে রাজী হয় নি।
৬. যৌতুকের কারণে দুটো পরিবারে আত্মীয়তা শত্রুতায় পরিণত হলো।
৭. জীবন সঙ্গিনী রেবেকা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে জেলে পাঠালো।
৮. জামাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শাশুড়ীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ করলো।
৯. ধ্বংস হলো যৌতুকের কারণে দুটো পরিবার।
১০. আত্মীয়তা শত্রুতায় পরিণত হল।

৯ আগস্টের জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ : বেগমগঞ্জে (নোয়াখালী) যৌতুকের দাবীতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেগমগঞ্জ থানার কুতুবপুর ইউপির মোহসেন আলীর কন্যা পেয়ারা বেগমের সাথে ১৯৯৯ সালে রসূলপুর গ্রামের নিজামুদ্দিনের বিবাহ হয়। বিয়ের পর থেকে যৌতুকের কারণে নিজামুদ্দিন তার স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করতে থাকে। গত শনিবার রাতে বসত ঘরে যৌতুক নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে পাষণ্ড স্বামী নিজামুদ্দিন স্ত্রী পেয়ারা বেগম (২৫) কে গলা টিপে হত্যা করে। স্ত্রীর লাশ তড়িঘড়ি করে কবরস্থ করার চেষ্টা করলে পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে। স্বামী পলাতক রয়েছে।[৪]

যৌতুকের উৎপত্তি

মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথা ছিল না। কারণ মুসলিম সমাজে মেয়েরা বাপের সম্পত্তির অংশ পায়, তাই এখানে যৌতুকের প্রয়োজন হয় না। এ জন্য ইসলাম যৌতুক প্রথার বিরোধী। তবে হিন্দু সমাজে যৌতুক প্রথার প্রচলন আছে। যৌতুক ছাড়া তাদের মেয়েদের বিবাহ হয় না। পিতাও মনে করেন মেয়ে বিবাহ দিতে হলে যৌতুক দিতেই হবে। তাই জমি জমা বিক্রী করে গরীব লোকেরা যৌতুকের টাকা সংগ্রহ করে। অন্যদিকে হিন্দু মেয়েরা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। তাই জামাই বিয়ের সময়ই যত পারে আদায় করে নেয়। বাংলাদেশের চারপাশেই হিন্দু দেশ ও সমাজ আছে এবং তাদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশেও অনেক হিন্দু পরিবার আছে। ফলে হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান যুবকেরাও যৌতুকের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই বাংলাদেশে যৌতুক একটি মারাত্মক ব্যাধি আকারে দেখা দিয়েছে এবং সমাজে বহু সমস্যার সৃষ্টি করছে। তাই যৌতুক প্রতিরোধ করার জন্য সরকার আইন তৈরী করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক

ইসলামে রয়েছে মোহরানা, যৌতুক নয়। মোহরানা হচ্ছে স্ত্রীর পাওনা এবং বিয়ের জন্য শর্ত। মোহরানা ছাড়া বিবাহ বৈধ হয় না। একটি মেয়েকে বাবা-মা আদর ও যত্ন সহকারে লালন পালন করে অপরিচিত একটি ছেলের হাতে চিরদিনের জন্য তুলে দিচ্ছে। ছেলে সেই মেয়েকে নিয়ে সংসার করছে, তার যৌবন ভোগ করছে। তারই নিরাপত্তার জন্য মোহরানা। ছেলে যে কোন সময় মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে তাই ইসলাম তার নিরাপত্তা বিধান করেছে মোহরানার মাধ্যমে। মোহরানা ছেলের সাধ্যের মধ্যে হতে হবে। যাতে সে সহজভাবে পরিশোধ করতে পারে, তাৎক্ষণিকভাবে বা কিস্তি তে কিস্তিতে। যা ছেলের পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয় এমন মোহরানা তার ওপর চাপান বৈধ নয়।

মোহরানা ছাড়া ছেলে ও মেয়ে খুশী মনে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে যদি একে অপরকে কোন উপঢৌকন, হাদীয়া দেয় তা ইসলামে বৈধ। কিন্তু শর্ত করে, জোর করে, চাপ সৃষ্টি

করে, কোন অর্থ-সম্পদ মেয়ের পক্ষ থেকে আদায় করা বা ছেলের পক্ষ থেকে আদায় করা ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ, যা আজকে আমাদের সমাজে চলছে।

আল কুরআনের বিধান

মুহরিম নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মোহর আদায় করবে। মোহর নির্ধারনের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজি হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা-২৪)

মুসলিম দেশসমূহে যৌতুক

মুসলিম দেশ বিশেষ করে আরব দেশসমূহে ছেলেদেরকে প্রচুর যৌতুক দিতে হয়। মেয়ের বাবা মেয়েকে বিবাহ দিতে প্রচুর টাকা, গহণা পত্রও দাবী করে। যার পরিণতি হিসেবে সেখানে ছেলেরা বিলম্বে বিয়ে করে। যৌতুকের কারণে অনেক মেয়ের বিবাহ আদৌ হয় না। তারা বিবাহ ছাড়া জীবন কাটিয়ে দেয়। রূপহীন মেয়েদের বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কারণ পয়সা দিয়ে যখন মেয়ে বিবাহ করবে তখন রূপহীন ও বয়স্কা মেয়ে কেন বিবাহ করবে। আল্লাহ বিবাহ সহজ করেছেন আর যিনা কঠিন করেছেন। যে সমাজে বিবাহ সহজ সে সমাজে যিনা কঠিন।

যৌতুক প্রথার কারণ

১. অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব। ২. সুশিক্ষার অভাব, যার ফলে শিক্ষিত যুবকেরাও যৌতুকের দাবী করে। ৩. হিন্দু সামজের প্রভাব। ৪. নৈতিক জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ আল্লাহ পাক, নবী, পরকাল, পরকালে জবাবদিহিতা, ন্যায় ও অন্যায়ের অনুভূতি জাগ্রত হওয়া ইত্যাদি জ্ঞানের অভাব। ৫. অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ ও উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা। ৬. স্ত্রীর চেয়ে সম্পদের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান। ৭. বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ। ৮. নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতা শূন্য থাক নীতিতে বিশ্বাস। ৯. নারীদেরকে পিতা-মাতার মিরাসী সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা। ১০. পাত্রের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। ১১. যৌতুক অনেক সময় মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হওয়া। ১২. বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় যৌতুক দাবী করে। ১৩. উচ্চ বংশ, উচ্চ শিক্ষার ও উচ্চ বিত্তের জন্য যৌতুক প্রদান করে। ১৪. মেয়ের রূপের ঘাটতি থাকলে যৌতুক প্রদান করে।

যৌতুকের কুফল

১. যৌতুক মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। ২. যৌতুক হচ্ছে মানুষের মধ্যে উদার মনোভাব ও উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক। ৩. যৌতুক নিজের স্ত্রীর প্রতি জুলুম নির্যাতন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. যৌতুক মানুষের হিতাহিত জ্ঞান হ্রাস করে। ৫. যৌতুক মেয়ের গরীব বাবাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়, ফলে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ৬. যৌতুক যুবকদের মধ্যে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। ৭. যৌতুক মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হবার এবং দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে অত্যাচারী হতে প্ররোচিত করে।

পারিবারিক সমস্যা

১. যৌতুকের বিবাহে কোন আনন্দ থাকে না। ২. যৌতুকের কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ৩. যৌতুকের কারণে উভয় পক্ষের আত্মীয়দের মধ্যেও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ৪. যৌতুকের কারণে গরীব পিতা-মাতা তাদের সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়। তার পরেও যৌতুকের টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। ৫. যৌতুকের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ ও আংশিক পরিশোধ না করার কারণে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চলতে থাকে। ৬. যৌতুক পরিশোধ না করার কারণে অনেক সময় বিবাহ ভেঙ্গে যায়। ৭. যৌতুকের কারণে পিতা-মাতার মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকার কারণে সন্তানেরা অসহায় বোধ করে। ৮. সর্বোপরি যৌতুকের কারণে পরিবারে কোন শান্তি থাকে না। ৯. যৌতুকের কারণে মেয়ের পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে।

যৌতুকের সামাজিক সমস্যা

১. যৌতুক সমাজে পরস্পরের মধ্যে মারামারি, হানাহানি ও হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। ২. যৌতুক যুবকদেরকে অন্যদের প্রতি নির্মম হতে এবং অমানবিক আচরণ করতে শিক্ষা দেয়। ৩. যৌতুক সমাজে অশ্লীল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটায়। ৪. যৌতুকের কারণে সমাজে কল্যাণমূলক কাজ উপেক্ষিত হয়। ৫. যৌতুকের কারণে গরীব ও অসহায় মানুষ শোষিত হয় এবং অসৎ লোক অবৈধ অর্থ লুণ্ঠণ করে। ৬. স্ত্রীর মূল্যায়ন হয় না। ৭. নারী নির্যাতন বাড়ে। ৮. তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায়। ৯. একজনের দেখাদেখি অন্যজনের মধ্যেও যৌতুক সংক্রমিত হয়। ১০. বহু বিবাহের প্রবণতা বাড়ে।

অর্থনৈতিক সমস্যা

১. অর্থের অপচয় হয়, যৌতুকের টাকা কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় না। ২. গরীব লোকেরা অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়। ৩. যুবকেরা কর্ম বিমুখ হয়। কারণ সহজেই বিনা পরিশ্রমে যৌতুকের টাকা পাওয়া যায়। ৪. সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে না। ৫. সৎভাবে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা কমে যায়। ৬. যৌতুক মানুষকে ঋণগ্রস্থ করে ফেলে।

যৌতুক বন্ধ করার উপায়

১. যৌতুক বন্ধ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ২. যৌতুকের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ৩. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা

ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। ৪. পাঠ্যবইতে যৌতুকের কুফল তুলে ধরতে হবে। ৫. মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও পরকালে জবাবদিহীর ভয় জাগ্রত করতে হবে। ৬. রেডিও, টিভি ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যৌতুকের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা এবং জনগণকে যৌতুক গ্রহণে অনুৎসাহিত করতে হবে। ৭. মসজিদের ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা মসজিদগুলোতে যৌতুকের কুফল এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি মুসল্লিদের নিকট তুলে ধরতে পারেন। ৮. বেকারত্ব দূর করতে হবে। কারণ বেকার ছেলেরাই যৌতুকের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। ৯. যৌতুকের আইন যাতে ফাঁকি দিতে না পারে সে জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১০. যৌতুক গ্রহণ অপরাধ কাজেই তার শাস্তির ব্যাপক প্রচার হওয়া উচিত। ১১. ছেলে ও মেয়েকে সমান দৃষ্টিতে দেখা। ১২. সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সম্পদশালী লোকেদের যৌতুক বিহীন বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পত্র পত্রিকায় প্রকাশ "চাষী কল্যাণ সমিতি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর ১৫০/২০০ জোড়া পাত্র-পাত্রির যৌতুক বিহীন বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে এবং বিবাহের পর তাদের পুর্নবাসনেরও ব্যবস্থা করে থাকে। এবছর থেকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় যৌতুক বিহীন বিবাহ চালু করেছেন যদিও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ ব্যবস্থা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

যৌতুকের কারণে বাংলাদেশে নারীরা নির্যাতনের শিকার

১৯৮২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত এক দশকে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬৪৫ জন। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে প্রাপ্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে গত ১০ বছরে ৫০ শতাংশ বিবাহিতা নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০০১ সালে সারাদেশে অন্তত ১২৮ জন মহিলা খুন হয়েছে। স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে ১৮ জন আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪০ জন। যৌতুক দিতে অক্ষম হওয়ায় তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে ১৫ জন। একই বছরে যৌতুকের কারণে সারা বাংলাদেশে মোট ২ হাজার ৭৭১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যৌতুকের জন্য নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১২৪ জন। যৌতুকের কারণে এসিডদগ্ধ করা হয়েছে ১২ জনকে। আত্মহত্যা করেছে ৯ জন। কিন্তু যৌতুকের ১২৪ টি নির্যাতনের জন্য মামলা হয়েছে মাত্র ৭০টি। হত্যার মামলা হয়েছে ১৬৬টি। এসিড নির্যাতনের জন্য মামলা হয়েছে ৮টি। এসিড দগ্ধের জন্য মামলা হয়েছে ৮টি। অগ্নি দগ্ধের জন্য ৫টি। (দৈনিক সংগ্রাম ২৪ আগস্ট ২০০৪)

বাংলাদেশে যৌতুক বন্ধের আইন

১৯৮০ সালে যৌতুক বন্ধ করার জন্য সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেছেন। আইন অনুযায়ী বিয়েতে কোন পক্ষ যৌতুক দাবি করলে তার শাস্তি হবে। অথবা কোন পক্ষ

যৌতুক নিলে বা দিলে তারও শাস্তি হবে। অথবা কেউ যৌতুক দেয়া বা নেয়াতে সাহায্য করলেও তার শাস্তি হবে। এ শাস্তি হয় এক বছর হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল। অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। অথবা উভয় রকম শাস্তি হতে পারে। ১৯৮৩ সালের আইন অনুযায়ী যৌতুকের কারণে স্ত্রীকে খুন করলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

তবে যারা যৌতুক নেয়া বেআইনী এবং যৌতুক নিলে শাস্তি পেতে হবে এ কথা জানার পরও যৌতুক নেয় তাদের এই পদক্ষেপের মধ্যে যদি যৌতুক আইনকে ফাঁকি দেবার বা অশ্রদ্ধা করার মানসিকতা থাকে তাহলে একে যৌতুক আইনের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ফলে এ জন্য আরো কঠোর শাস্তির বিধান করা প্রয়োজন।

যৌতুক মামলার সময়সীমা

যৌতুক মামলার সময় সীমা অর্থাৎ যৌতুকের জন্য মামলা দায়ের করতে হলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করতে হবে। আইনানুযায়ী অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। তা না হলে সে অভিযোগ আদালত গ্রহণ করবে না।[৫]

বিবাহ বন্ধন মানব জীবনের এক পবিত্র স্মরণীয় ও মধুময় ঘটনা। বিয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি সুন্দর সংসার, পরিবার, সমাজ ও পবিত্র জীবন। কিন্তু যৌতুকের কারণে জীবনে মুখ্য হয়ে ওঠে দেনা-পাওনার বৈষয়িক দরকষাকষি, যার পরিণামে দেখা দেয় নির্যাতন এবং মানবতা ও মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা।

যৌতুক প্রথার শিকড় সমাজের গভীরে প্রোথিত। একে উপড়ে ফেলতে হলে এবং এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে নৈতিক ও আল কুরআনের শিক্ষা লাভ করতে হবে। সন্তানদের শিক্ষার মধ্যে আল কুরআনকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়কে গড়ে তুলতে হবে।

<u>তথ্যপঞ্জি</u>

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আই ন২০০০

২. ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন (৩৩ নং আইন)

৩. দৈনিক সংগ্রাম ২৯ জুলাই ২০০৪ (ফুট নোট)

৪. দৈনিক সংগ্রাম- ৯ আগস্ট ২০০৪ (ফুট নোট)

৫. ১৯৮০ সালের ৩৪ নং যৌতুক বিরোধী আইন ধারা-৭

ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কুরআনের আইন

মু: শওকত আলী

ক) দায়িত্ব

চুক্তি সম্পাদনে

১. হে ঈমানদারগণ, বন্ধনসমূহ পুরোপুরি মেনে চল। (সূরা- আল মায়েদা, আয়াত- ১)

২. ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৩৪)

ভবিষ্যত দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে

১. হে ঈমানদারগণ যদি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর তবে তা লিখে নাও।

২ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সতর্কতার সাথে তা লিখতে হবে।

৩. আল্লাহ্ যাকে লেখাপড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লেখার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়।

৪. সেই ব্যক্তি যার উপর এই ঋণ চাপছে তিনি লেখার বিষয় বলে দেবেন। এ ক্ষেত্রে তার প্রভু আল্লাহকে তিনি ভয় করবেন। যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কোন প্রকার কম বেশী করা না হয়।

৫. কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখ্য বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে তার ওলি বা অভিভাবক ইনসাফ সহকারে তা লিখিয়ে দেবে।

৬. অতপর পুরুষদের মধ্য হতে দুজনকে তার সাক্ষী বানিয়ে নাও। দুজন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৭. সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তা তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়।

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, জয়েন্ট সেক্রেটারি ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এই বাংলাদেশ।

৮. ব্যাপার ছোট হোক কি বড় - মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তার দস্তাবেজ লিখিয়ে নেয়াকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহর নিকট এই পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সু-বিচার মূলক। এর কারণে সাক্ষ্য কায়েম করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৯. অবশ্য যে সব ব্যবসা সম্পর্কীয় লেনদেন তোমরা পরস্পর হাতে হাতে বা নগদ করে থাক তা লিখে না নিলে কোন দোষ নেই।

১০. কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে।

১১. লেখক বা স্বাক্ষীর এই লিখিত চুক্তির ক্ষেত্রে কোন আইনগত দায়িত্ব নেই।

১২. যদি কেউ তাদের উপর অনুরূপ কোন দায়িত্ব অর্পণ করে কষ্ট দেয় তাহলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে সঠিক অর্থনীতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন। (সূরা- বাক্বারা, আয়াত-২৮২)

১৩. তোমর যদি প্রবাসে থাক এবং চুক্তি লিখার জন্য কোন লোক পাওয়া না যায় তবে রেহেন বা বন্ধক দ্বারা কাজ সম্পন্ন কর।

১৪. তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো উপর নির্ভর করে তার সাথে কোন কাজ করে তবে যার উপর নির্ভর করা হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং আল্লাহকে ভয় করে চলা।

১৫. এবং সাক্ষ্য কখনো গোপন করবে না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নয়। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৩।

কিসাসের প্রতিক্রিয়া

মুহতামারাম, সম্পাদক সাহেব। সালাম নিবেন। 'ইসলামী আইন ও বিচার' একটি যুগান্তকারী প্রকাশনা। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। সেই সাথে ডিসেম্বর ২০০৩ সালে প্রকাশিত ইসলামী আইন ও বিচার সংখ্যায় 'মৃত্যুদণ্ড পক্ষ বিপক্ষ' প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে এ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আরয করছি।

রাসূল স. এর আবির্ভাবের আগে জাহেলিয়াতের যুগে আরব সমাজে রীতি ছিলো কোন সমাজ বা গোত্র তাদের খুন হওয়া ব্যক্তির জীবন ও রক্তকে যতটুকু দায়ী মনে করতো খুনী বা ঘাতকের গোত্র বা খান্দান ততটুকুই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো। নিহতের জীবনের প্রতিশোধ হিসেবে শুধু হত্যাকারীর জীবননাশেই তারা শান্ত হতো না। নিহতের প্রতিশোধ নিতে ঘাতকের গোত্রের নিরপরাধ হাজারো মানুষের জীবনহানি ঘটানোর মধ্যেও তারা কোন অপরাধ বোধ করতো না বরং এটাকে ভাবতো বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ।

কোন গোত্রের কোন অভিজাত লোককে যদি অন্য গোত্রের অখ্যাত লোক হত্যা করতো তাহলে নিহতের আপনজনেরা শুধু হত্যাকারীর জীবননাশ করেই সন্তুষ্ট হতো না, তারা হত্যাকারীর গোত্রের কয়েকজনের জীবননাশ করতে চাইতো। কারণ হত্যাকারীর তুলনায় নিহত ব্যক্তি ছিল খ্যাতিমান ও অভিজাত। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তি যদি কোন নগন্য, সাধারণ লোক হতো আর হত্যাকারী হতো খ্যাতিমান ও অভিজাত তাহলেও তারা অধমব্যক্তির হত্যার কারণে হত্যাকারীর জীবনহানিকে সমর্থন করতে পারতো না। এই ছিলো জাহেলি যুগের বিচার চিত্র। একই চিত্র আজকের কথিত প্রগতিশীল সমাজেও বিদ্যমান।

বিশ্বের অনেক শক্তিধর রাষ্ট্রশক্তি তো প্রকাশ্যেই বলছে, আমাদের একজন নাগরিকের উপর আঘাত করলে আমরা গোটা দেশ ধ্বংস করে দেব। গোষ্ঠী নির্মূল করে ফেলব ইত্যাদি।

১১ সেপ্টেম্বরের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বিমান হামলার অনির্দিষ্ট অভিযোগে আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তানের নারী শিশুসহ নিরপরাধ লোকদের নির্বিচারে হত্যা করছে। একজনের বদলে ওরা জীবন নিচ্ছে শত সহস্র জনের। তাতেও আমেরিকার ক্ষোভ দমেনি, ইরাকের সাদ্দামের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেখানকার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। শুধু এখানেই জাহেলীয়াতের আধুনিকীকরণ শেষ নয়। একই নীতিতে ফিলিস্তিনীদের নির্বংশ করছে ইহুদীরা।

অনুরূপ নব্য জাহেলদের বিচার বিভাগও জাহেলিয়্যাতের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। তাদের বিচার ব্যবস্থায়, হত্যাকারী যদি শাসক ও বেঈমান হয় আর নিহত ব্যক্তি যদি হয় শাসিত ও ঈমানদার সে ক্ষেত্রে তাদের বিচারকরা কিসাসের বিচার করতে পারে না। এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইহুদী শাসক এরিয়েল শ্যারন। বিশ্ব আদালতে শ্যারনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার নারী শিশু অসহায় মানুষকে হত্যার প্রামাণ্য অভিযোগ উত্থাপনের পরও তারা খুনীর বিরুদ্ধে শাস্তির রায় দিতে পারেনি। বেঈমান ও কাফেরদের এই বৈষম্য ও বিচারের ব্যবধান দূর করতেই আল্লাহতাআলা ইসলামী শরীয়তে কিসাসের বিধান দিয়েছেন এবং বলেছেন, "নিশ্চয়ই কিসাসে (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডে) রয়েছে জীবন।" (আল বাকারা ১৭৮)

ইসলাম মানবতার বিধান। তাই হত ও হত্যাকারীকে পরস্পর ভাই আখ্যা দিয়ে পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়েছে ইসলাম। এই আয়াতের নির্দেশ থেকে বুঝা যায় ইসলামী আইন বিচারের ক্ষেত্রে যেমন মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছে সেই সাথে হত্যাকারীর কাছ থেকে রক্তপণ নিয়ে হত্যাকারীকে জীবন ভিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও রেখেছে। জাহেলী যুগের মানুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় মাত্রা ছাড়িয়ে একজনের মৃত্যুতে বহুজনের জীবনহানি ঘটাতো। পক্ষান্তরে কথিত পশ্চিমা মানবতাবাদীরা মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবহীন করে ফেলেছে। ফলে অশিক্ষিত লোকেরাও মৃত্যুদণ্ডকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। বহু দেশে তো মৃত্যুদণ্ড রহিত করে দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীম এই মাত্রাতিরিক্ততাও সীমালংঘনকেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছে। মানবজীবন খুবই দামী জিনিস। কেউ যদি কারো প্রাণ সংহার করে তবে তাকে খুন করা হবে। যারা মানুষের জীবন হরণকারীর জীবনকে মূল্য দিতে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তারা আসলে সুশীল সমাজকে অপমান করে এবং অশিষ্ট অপরাধীদের সম্মান করে। অথচ কুরআন বলেছে, তোমরা অপরাধীদের শাস্তি দাও, এ শাস্তি দানেই রয়েছে সুশীল সমাজের জীবন। পক্ষান্তরে অপরাধীকে ক্ষমা করার অর্থ হচ্ছে অপরাধকে লালন করা সুশীল সমাজের মানুষকে হত্যাযোগ্য করা। প্রকৃত পক্ষেই এটা অপরাধ নির্মূলের বদলে অপরাধকে লালন করে। বস্তুত আমার দাবী হলো– কুরআনে বর্ণিত হদ ও কিসাসকে বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে আইনসিদ্ধ করে বাস্তবায়ন করার দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হোক। তা হলে অপরাধ দ্রুত কমে যাবে।

মুস্তাকিম ফারুকী
জাবাল, সৌদী আরব